গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৮ সংখ্যা-৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

সূচি

১ আমাদের কথা

২ হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গগুলি ও পর্বতাভিযান

দেবাশিস বিশ্বাস

৮ বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার

ডা: শঙ্কর কুমার নাথ

১৩ হিমালয়ের কৃষি ও পশুপালন

শমীক দে

১৬ হিমালয়ের পাঁজরভাঙা উন্নয়ন

অনুপ হালদার

২০ হিমালয়ের অরণ্য : বিপন্নতার ইতিবৃত্ত

মানস প্রতিম দাস

২৪ হিমালয়ের বুক ইতিহাসের চলাফেরা

গার্গী নাগ মজুমদার

২৭ হিমালয়ের জনজাতি

প্রবীর বসু

৩০ হিমালয়ের বিপন্ন পরিবেশ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

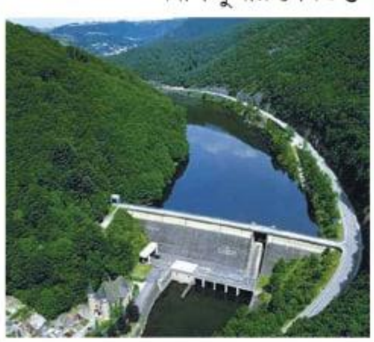

৩য় প্রচ্ছদ কবিতায় হিমালয়

চন্দ্রশেখর ঘোষ

অমর ঘোষ

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

৪র্থ প্রচ্ছদ হিমালয়ে যারা হারিয়ে গেছে

রাজা রাউত

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক

তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সরদার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9874778216 / 9143264159/7980121478

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা
তাপস মজুমদার

সুভাষিতম্

'মাটি আমাদের, জল আমাদের, এই বনও তো আমাদের। পিতৃপুরুষেরা লাগিয়েছিল এই বন। আমরাইতো তাকে বাঁচাবো।'

—সুন্দরলাল বহুগুনা

আমাদের কথা

আমি হিমালয়

'আমি হিমালয়। সেই কত যুগ আগে (প্রায় ৫৪৫ কোটি বছর আগে) আমার সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর জন্ম। সে তুলনায় আমি নিতান্তই নবীন। ২২ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে টেথিস সাগরে নিমজ্জিত ইউরোপীয় পাত ও ভারতীয় পাতের সংঘর্ষে আমার উৎপত্তি। তারপরেও কত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে, টেথিস-হিমাদ্রি-হিমাচল-শিবালিক হিমালয়ের গড়ে ওঠা দিয়ে এখনকার আমি হয়েছি। এরই মধ্যে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে লক্ষ প্রজাতির প্রাণী আমার বুকে আশ্রয় নিয়েছে। আমারই উচ্চ অবস্থানের বরফ গলে তৈরি হয়েছে কত নদী ও জলধারা। সেই জল-প্রাণে সিঞ্চিত হয়েছে সকল জীব। আমারই কারণে সমতলে এসেছে বৃষ্টি। বাধা পেয়েছে মরুভূমির শুষ্ক আবহাওয়া। আমি হয়ে উঠেছি পরিপূর্ণ মাতৃসমা।

কিন্তু এখন আমি খুব কষ্টে আছি। প্রকৃতির বিবর্তনের নিয়মে ৬০ লক্ষ বছর আগে যে মানুষ নামক প্রজাতি পৃথিবীতে এলো, তারা এখন 'ফ্রেঙ্কেনস্টাইন'। প্রথম দিকে আমার অন্যান্য সন্তানদের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। কালক্রমে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিতে শক্তিমান কয়েকজনের ক্ষমতা ও লোভে শেষ ২০০ বছরের মধ্যে আমি ও আমার সন্তানেরা ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই মানুষ শতাধিক বছরের বড় বড় গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলেছে। সাথে সাথে শেষ হয়েছে ঐ বৃক্ষ-নির্ভর অসংখ্য প্রাণীকুল। আমার বুকের দুগ্ধ ধারার মত অসংখ্য নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে নদীগুলিকে মৃতপ্রায় ও তৎসংলগ্ন প্রাণকে বলি দেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট, বাড়ি ও অন্যান্য নির্মাণকর্মের ফলে আমাকে ভঙ্গুর করে তোলা হয়েছে। আমার পাঁজর খুঁড়ে সঞ্চিত খনিজ লুট করছে। আমার অস্তিত্বই আজ বিপন্ন। তাই আমি ভালো নেই। আমি কষ্টে আছি। আমি কষ্টে আছি।'

* * *

প্রশ্ন, হিমালয়ের এই ভাবনা কি কাল্পনিক না বাস্তব? যাইহোক, হিমালয়ের এই ভাবনার সাথে আমরা একমত। আপনাদের কি মত?

—তাপস মজুমদার

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১/৯৪৩২৩৩৫৮৮২

দেবাশিস বিশ্বাস

হিমালয়ের পর্বতশৃঙ্গগুলি ও পর্বতাভিযান

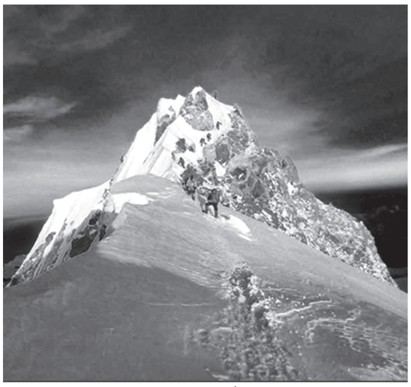

এভারেস্ট

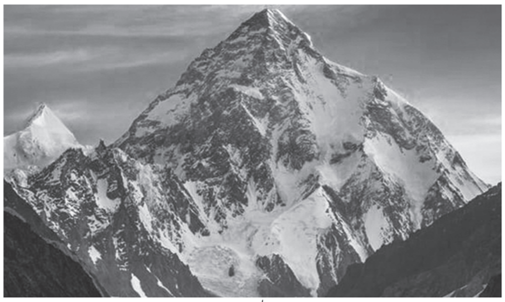

কে-টু

কাঞ্চনজঙ্ঘা

মাকালু

লোৎসে

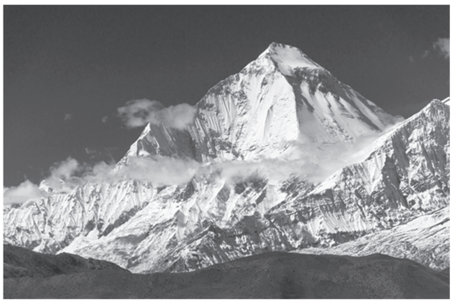

ধৌলগিরি

‘হিমালয়’ শব্দটি এসেছে ‘হিম’ বা ‘বরফ’ এবং ‘আলয়’ অর্থাৎ ‘বাসস্থান’ থেকে। অর্থাৎ হিমালয়ের অর্থ বরফের দেশ। পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বত থেকে পূর্বে নামচে বারওয়া পর্যন্ত প্রায় ২,৮০০ কিলোমিটার হিমালয়ের বিস্তৃতি। পঞ্চাশটির বেশি ৭,২০০ মিটারের অধিক উচ্চতার ও দশটি ৮,০০০ মিটারের অধিক উচ্চতার শৃঙ্গ রয়েছে হিমালয়ে। এখানে বলে রাখা দরকার পৃথিবীতে মোট ১৪টি ৮,০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার শৃঙ্গ রয়েছে, যাদের বলা হয় ‘ফর্টিন এইট থাউজ্যান্ডার’। উচ্চতার দিক থেকে এগুলি হল— এভারেস্ট, কে-টু বা গডউইন অস্টিন, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে, মাকালু, চোয়ু, ধৌলগিরি, মানাসলু, নাঙ্গা পর্বত, অন্নপূর্ণা, ঘাসেরব্রুম-১, ব্রড পিক, ঘাসেরব্রুম-২ ও শিশাপাংমা। এদের মধ্যে কে-টু, ঘাসেরব্রুম-১, ব্রড পিক ও ঘাসেরব্রুম-২ রয়েছে হিমালয়েরই পাশের কারাকোরাম গিরিশ্রেণিতে। বাকি দশটার অবস্থান হিমালয়ে। ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটি বড় নদী— সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হিমালয়ে। এছাড়াও অগণিত নদী পুষ্ট হয়েছে হিমালয়ের বরফ

কালো দাগ চিহ্নিত সিল্করুট

গলা জলে। দশটি আট হাজারি শৃঙ্গ ছাড়াও অসংখ্য লেক, প্রচুর হিমবাহ এবং অগুনতি পাঁচ, ছয় ও সাত হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার শৃঙ্গ রয়েছে হিমালয়ের বুকে। আমরা ভারতবাসীরা নিজেদের অনেক সৌভাগ্যবান মনে করতে পারি কারণ আমাদের একদম হাতের কাছে রয়েছে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিস্ময় এই হিমালয়। সারাজীবন ব্যাপী পরিক্রমাতেও এর সামান্য অংশ জানা বা চেনা হয়ে ওঠে না।

হিমালয় দুর্গম হলেও পান্ডব বর্জিত এলাকা ছিল না, তার প্রমাণ আমরা পুরান রামায়ন-মহাভারতে বারে বারে পেয়েছি। হিমালয়ের উত্তরের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে হিমালয়ের দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্যের বাণিজ্যিক লেনদেন বহুকাল আগে থেকেই ছিল। সেসব বাণিজ্যিক পথগুলো পরিচয় পেয়েছিল সিল্করুট নামে। বিভিন্ন চিনা পরিব্রাজকেরা এসব পথেই এসে পৌঁছেছিলেন ভারতবর্ষে। পশ্চিম তিব্বতে রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মগুরু অতীশ দীপঙ্কর ১০৪০ সালে বিক্রমশীল বিহার থেকে তিব্বত যাত্রা শুরু করেন। তিনি নেপালের কাঠমান্ডু হয়ে কালী গণ্ডকী নদীর গিরিখাত ধরে মুক্তিনাথ পার করে মুস্তাং-এর পথে তিব্বতে প্রবেশ করেন। এরপর মানস সরোবর হয়ে শতদ্রু উপত্যকায় যান। সেখান থেকে কর্ণালী উপত্যকা পরিদর্শন করে প্রথমে পূর্বদিকে বহু পথ ঘুরে শেষে উত্তর মুখে চলে লাসায় উপস্থিত হন। সেই সময়কার এক অসাধারণ হিমালয় পরিক্রমা এটি। সে হিসাবে এরা সবাই তো ছিলেন পর্বত অভিযাত্রী।

১৭৮৮-৯০ সালে রামমোহন রায় ভুটানের পথে তিব্বত যাত্রা করেন। ১৮১১ ও ১৮১৫ সালে তিনি ভুটানে যায়। ১৮৪০ সালে রাধানাথ শিকদারের পিতা তিতুরাম কেদার-বদ্রী পরিক্রমা করেন।

১৮৫২ সালে অনেক জটিল গণনা শেষে রাধানাথ শিকদার

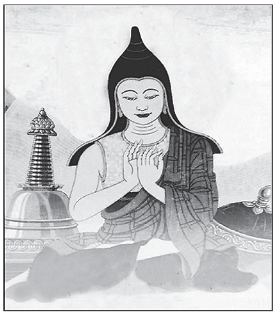
অতীশ দীপঙ্কর

রামমোহন রায়

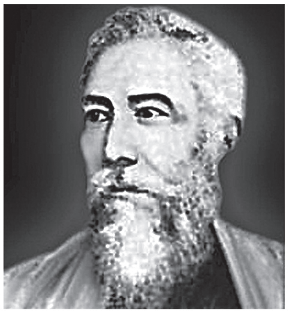
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্র দাস

প্রমথনাথ বসু

জগদীশচন্দ্র বসু

অবলা বসু

বিবেকানন্দ

নিবেদিতা

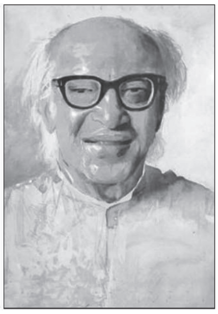
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

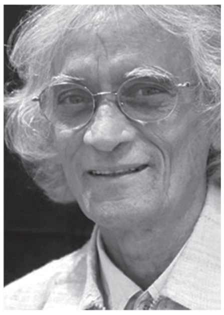
বিমল দে

আবিষ্কার করেন হিমালয় পর্বতমালার পিক ফিফটিন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট। পিক ফিফটিন পরবর্তীকালে মাউন্ট এভারেস্ট হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

১৮৫৬-৫৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলা-নারকান্ডা হয়ে শতদ্রু উপত্যকার সুঙ্গ্রি পর্বতে যান। ১৮৬৮ সালে তিনি কাশ্মীরের দিক থেকে পিরপাঞ্জাল গিরিবর্ত্ম (১২,০০৮ ফুট) অতিক্রম করেন।

১৮৭৯ সালে শরৎচন্দ্র দাস সিকিমের কাং-লা (১৬,৩১৩ ফুট) পেরিয়ে পূর্ব নেপাল প্রবেশ করেন। একাধিক গিরিবর্ত্ম এবং হিমবাহ পার হয়ে তিনি কাংবাচেন গ্রামে যান। কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরে জঙসঙ-লা (২০,২০৭ ফুট) পেরিয়ে উত্তর সিকিমে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে তিব্বত গিয়ে, উত্তর সিকিমের লাচুং উপত্যকা হয়ে দার্জিলিং ফেরেন। ১৮৮১ সালে শরৎচন্দ্র দাস ফের কাংবাচেন হয়ে তিব্বতে যান। পরের বছর তিনি লাসা পরিদর্শন করে সিকিমের লাচেন উপত্যকার উপর দিয়ে দার্জিলিঙে ফেরেন। ১৮৮৯ সালে প্রমথনাথ বসু সান্দাকফু থেকে সিঙ্গালিলা গিরিশিরার উপর দিয়ে সিকিমের জোংরি হয়ে গোচা-লা পৌঁছান। ১৮৯৪ সালে জগদীশচন্দ্র বসু ও তার স্ত্রী অবলা বসু সরযুর উৎস পরিদর্শন শেষে পিণ্ডারি হিমবাহ পর্যবেক্ষণ করেন। এই অভিযান শেষে তিনি রচনা করেন তাঁর কালজয়ী অভিযান কাহিনি 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে'। ১৮৯৮ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা বালতালের পথে অমরনাথ যাত্রা ব্যর্থ হওয়ায় পথ পাল্টে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যাত্রা করেন।

১৯২৪ সালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেদার-বদ্রী যাত্রা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বেরিয়ে পড়েন কৈলাস-মানস যাত্রায়। ১৯৩৬ সালে তিনি অমরনাথ দর্শন করেন।

১৯৩৫ সালে সতীশ রঞ্জন দাস দুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের শিক্ষক ছাত্ররাই পরবর্তীকালে ভারতীয় পর্বতারোহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫১ সালের ৬ অক্টোবর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নেপালের আইল্যান্ড পিক (২০,৩০৫ ফুট) আরোহন করেন। সেটাই বাঙালিদের মধ্যে প্রথম পর্বতারোহণ। এছাড়া শ্রী দত্ত একাধিক শৃঙ্গ আরোহনের চেষ্টা চালান ও বহু গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। ১৯৫৩ সালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আরেক আরোহী দেবশংকর শীলের সাথে পশ্চিম বাংলার প্রথম পর্বতারোহণ সংগঠিত করেন সিকিমের অবিজিত শৃঙ্গ পান্ডিম-এ (২১,৯৫৩ ফুট)। অভিযানে সহায়তা করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এবং প্রথম এভারেস্ট আরোহী তেনজিং নোরগে। কিন্তু তিন তিনবার মরণপণ চেষ্টা করেও সফল আরোহণ করতে পারেননি।

১৯৫৩ সালের ২৯ মে প্রথম আরোহণ হয় পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট। আরোহন করেন নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে শেরপা। পরের বছরই ভারতের প্রথম পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠা হয় দার্জিলিঙে।

১৯৫৬ সালে সতেরো বছরের তরুণ বিমল দে মৌন সাধুর বেশে নাথুলার পথে চুম্বি উপত্যকার উপর দিয়ে লাসা পৌঁছন। সেখান থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে মানস-কৈলাশ পরিদর্শন করেন এবং অবশেষে লিপুলেখ-এর পথে আলমোড়া হয়ে নৈনিতালে পৌঁছন। এপথে তিনি মোট দুই হাজার কিলোমিটারের হিমালয় পথ-পরিক্রমা করেন।

১৯৬০ সালে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'হিমালয়ান ইনস্টিটিউট'-এর উদ্বোধন হয়। পরে এরই নাম হয় 'হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সে বছরই ২২ অক্টোবর সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্বিতীয় পর্বত অভিযানে সফল আরোহণ হয় নন্দাঘুন্টি শৃঙ্গ (২০,৭০০ ফুট)। পর্বতাভিযানে বাংলা থেকে প্রথম দলগত সাফল্য এটাই। একই বছর কলকাতার জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি

এডমণ্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে

গ্যাংস্ট্যাং (২০,২১৮ ফুট) অভিযানের আয়োজন করে। কিন্তু অতিরিক্ত তুষারপাতের জন্য শৃঙ্গ থেকে মাত্র ২১০ মিটার নিচে থেকে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

১৯৬২ সালে অমূল্য সেনের নেতৃত্বে নিতাই রায় ও ভানু ব্যানার্জি ২৬ অক্টোবর নীলগিরি (২১,২৪০ ফুট) শিখরে আরোহণ করেন। ১৯৬৪ সালের পঞ্চুচুল্লী-৩ শিখরের অন্যতম শীর্ষারোহী ছিলেন অমূল্য সেন। ১৯৬৫ সালে এক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানে যোগ দিয়ে অমূল্য সেন ২২ মে চন্দ্র পর্বত (২২,০৭৩ ফুট) আরোহণ করেন। পরের বছর ১৯৬৬ সালে চঞ্চল মিত্রের নেতৃত্বে আরোহণ হয় সাত হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার অবিজিত শৃঙ্গ ত্রিশূলী (২৩,২১০ ফুট)। ত্রিশূলীর চাঞ্চল্যকর সাফল্যের সাথে সাথে সে বছরই সুজিত বসু আরোহণ করে ভাগীরথী-২ (২১,৩৬৪ ফুট), বিশ্বদেব বিশ্বাস সফল হন মানা শৃঙ্গে (২৩,৮৬০ ফুট), বিশ্বেশ্বর ঘোষ আরোহণ করে 'রুদ্রগয়রা'। ১৯৭৮ সালে চঞ্চল মিত্রের নেতৃত্বে আরোহণ হয় আর এক সাত হাজার মিটারের বেশি উচ্চতার শৃঙ্গ হরদেউল (২৩,৪৬০ ফুট)।

পর্বতারোহণে ভারতীয় মহিলারা একটু দেরিতেই এসেছেন। বাঙালিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৬৫ সালের ২৩ জানুয়ারি ভক্তি বিশ্বাসের উৎসাহ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে শুরু হয় শৈলারোহণ প্রশিক্ষণ শিবির। মোট চব্বিশজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছিলেন পাঁচজন মহিলা। ১৮৬৭ সালে দীপালি সিনহার নেতৃত্বে সংঘটিত হয় রন্টি (১৯,৮৯৩ ফুট) অভিযান। দুইজন শেরপা সহ স্বপ্না মিত্র ২৮ অক্টোবর রন্টি শিখরে আরোহণ করেন। এই অভিযানের দুই সদস্যা সুজয়া গুহ ও সুদীপ্তা সেনগুপ্ত ১৯৭০ সালের বাংলার প্রথম সর্বমহিলা অভিযানের দলনেত্রী ও সহ-দলনেত্রী ছিলেন। বড়া সিগরি হিমবাহের এক অনামা শিখর (২০,

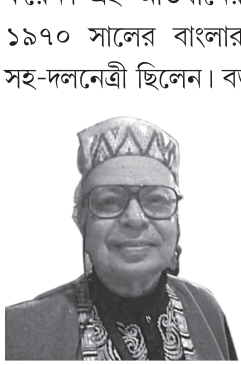

চঞ্চল মিত্র

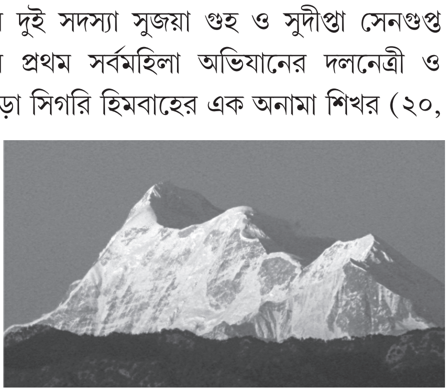

ত্রিশূলী শৃঙ্গ

১৩০ ফুট) তারা আরোহণ করেন। আরোহণ করে তারা শিখরটির নাম দেন 'ললনা'।

পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহণ

আজ যারা পর্বতারোহণের সঙ্গে যুক্ত তারা কিন্তু প্রথম দিন শুরুতেই কোন অভিযান দিয়ে পর্বতারোহণ শুরু করেননি। অন্যান্য যেকোনো স্পোর্টসের মতন পর্বতারোহণও ধাপে ধাপে এগোয়। আমাদের বাংলার পর্বতারোহীদের পর্বতারোহণ শিক্ষা সাধারণত শুরু হয় একদম

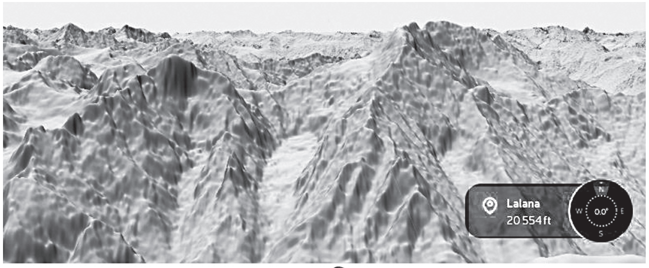

ললনা শিখর

তিন ললনা

ছোট ছোট বিভিন্ন রকমের রক ক্লাইম্বিং কোর্স বা শৈলারোহণ শিক্ষণ শিবির মারফত। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন সংগঠন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় চারদিনের শীতকালীন শিবির বসায়। শীতের শুরুতেই এই ধরনের শিবির অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার শুশুনিয়া, মাঠাবুরু, গজাবুরু, জয়চণ্ডী, বেরো পাহাড় ইত্যাদি জায়গায়। আজ যারা পর্বতারোহণের সাথে জড়িয়ে রয়েছ, তাদের প্রত্যেকেই কোন না কোনও সময় এই ধরনের রক ক্লাইম্বিং কোর্স বা শৈলারোহণ শিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়ে ধীরে ধীরে নিজেদের তৈরি করেছে। অতএব এই জায়গাগুলোকে বলা যেতেই পারে বাংলার পর্বতারোহণের আঁতুড়ঘর। পশ্চিমবঙ্গের পর্বতারোহীদের হাতেখড়ি হয় যেসব ছোট ছোট পাহাড়গুলোয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হল শুশুনিয়া। ১৯৬৫ সালে শুশুনিয়া পাহাড়ে Rock climbing-এর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে সেই যাত্রা আজও অব্যাহত রয়েছে। এই শিবিরগুলোতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীদের পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চারের পাঠ পড়ানো হয়। সাথে সাথে শেখানো হয় নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও বিনম্রতা। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীদের মনে পরিবেশের প্রতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি আগ্রহ তৈরির চেষ্টা করা হয়। সাথে সাথে তাদের চারিত্রিক গঠনের প্রচেষ্টা চালান হয়। সমাজের প্রতি, সমাজ

গঠনের প্রতি সকলের ভূমিকা আছে, সে সবই পর্বতারোহণ ও অ্যাডভেঞ্চার শিবিরগুলিতে শেখানো হয়। এরপর সেই রক ক্লাইম্বিং শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা বারবার শুশুনিয়া, মাঠা ইত্যাদি পাহাড়ে গিয়ে রক ক্লাইম্বিং প্র্যাকটিস চালিয়ে যায়।

অল্প অভিজ্ঞতা বাড়লে শুরু করে হিমালয়ে বিভিন্ন লো এবং হাই অল্টিটিউড ট্রেকিং। এভাবেই ধীরে ধীরে সে বুঝে যায় তার শরীর উচ্চতার সাথে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারছে কি না। এভাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তারা যায় বিভিন্ন মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট-এ। মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করার জন্য আমাদের দার্জিলিঙে রয়েছে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (HMI)। এরকমই উত্তর কাশীতে রয়েছে নেহেরু ইনস্টিটিউ অফ মাউন্টেনিয়ারিং (NIM), পহেলগাঁওতে রয়েছে জওহরলাল ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনিয়ারিং (JIM)। এইরকমই মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট রয়েছে মানালিতে এবং আরো কিছু জায়গায়। মূলত ২৮ দিনের হয় কোর্সগুলো। বেসিক ও অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স। বেসিকে A গ্রেড পেলে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অর্জন করে পরবর্তী অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স-এ যোগ দিতে। এভাবে বেসিক আর অ্যাডভান্স

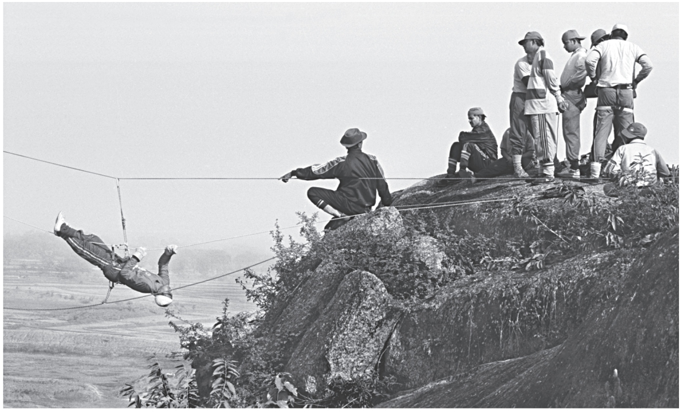

বেরো পাহাড়ে পর্বতারোহন প্রশিক্ষন

মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করার সাথে সাথে তারা সবদিক থেকে বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত হয়ে যায়।

এরপর তাঁরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পর্বতাভিযান বা মাউন্টেনিয়ারিং এক্সপিডিশনে। প্রথমে অপেক্ষাকৃত সহজ সহজ অভিযান। এভাবেই অভিজ্ঞতা বাড়লে ধীরে ধীরে দুর্গম শৃঙ্গগুলোর দিকে পা বাড়াতে শুরু করে তারা। ভারতীয় হিমালয়কে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন কাশ্মীর হিমালয়, লাদাখ হিমালয়, হিমাচল প্রদেশ-এর হিমালয়, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, সিকিম হিমালয় ও অরুণাচল প্রদেশের হিমালয়। দুর্গমতার জন্য এবং সুযোগ-সুবিধা কম থাকার জন্য অরুণাচল প্রদেশে অভিযান খুব কম হয়। আর বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকার জন্য বর্তমানে আরোহীরা সিকিমে পর্বত অভিযান থেকে বিরত থাকছে, ফলে সিকিমে পর্বত অভিযান হচ্ছে বেশ কম।

উত্তরাখণ্ডকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্বদিকের অংশকে বলা হয় কুমায়ুন আর পশ্চিমদিকের ভাগ গাড়োয়াল। পিথোরাগড়, বাগেশ্বর, আলমোড়া, নৈনিতাল এসব কুমায়ুন অংশে। অন্যদিকে চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, তেহরি, উত্তরকাশী, দেরাদুন, হরিদ্বার এসব গাড়োয়ালে। কুমায়ুন হিমালয়ে যেসব শৃঙ্গে বেশি পর্বতাভিযান হচ্ছে সেগুলো হল— নন্দাখাত, নন্দাকোট, থারকোট, পঞ্চচুল্লী, বালিজুরি ইত্যাদি শৃঙ্গ। অন্যদিকে গাড়োয়াল হিমালয়ে অসংখ্য নামীদামি শৃঙ্গের অবস্থান। বহু অভিযান হয় এখানকার বিভিন্ন শৃঙ্গগুলিতে। তাদের মধ্যে যেসব শৃঙ্গে বেশি অভিযান হয় সেগুলো হল কামেট, আবিগামিন, কালানাগ বা ব্ল্যাক পিক, চৌখাম্বা, সতোপন্থ, সুদর্শন, গঙ্গোত্রী, কোটেশ্বর, শিবলিঙ্গ, শ্রী কৈলাশ, বন্দরপুঞ্চ, স্বর্গারোহিণী, কেদারডোম, ভাগীরথী, যোগিন, কালিন্দী, মানা, ত্রিশূল ইত্যাদি।

উত্তরাখণ্ডের সরকার বর্তমানে অভিযানগুলোর উপর বিভিন্ন রকম চার্জ বসিয়ে দেওয়াতে অনেকেই উৎসাহী হচ্ছে লাদাখ কিংবা হিমাচল প্রদেশে অভিযান চালানোয়। হিমাচল প্রদেশের যে শৃঙ্গগুলোর দিকে অভিযাত্রীরা ছুটে চলেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল লিওপারগিল, মনিরাং, ইউনাম, ফ্লুটেড, চন্দ্রভাগা গ্রুপের বিভিন্ন শৃঙ্গ, কাংলা টার্বো, করচা পর্বত, গ্যাংস্ট্যাং, KR গ্রুপ, মেনথোসা, রামযাক, দেওটিব্বা, ইন্দ্রাসন, দেবাচেন, শিবা, ধর্মসুরা, রুবলকাং ইত্যাদি।

পর্বত অভিযানের জন্য কোন শৃঙ্গ বেছে নেওয়া হবে সেটা নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের উপর। প্রথমেই যেটা হিসাবে আসে সেটা হল অভিযানের খরচ। বড় শৃঙ্গ অভিযানে সাধারণত খরচ বেশি হয়। আর যেসব শৃঙ্গ টেকনিক্যালি কঠিন সেখানে অনেক বেশি পরিমাণে উপকরণ দরকার পড়ে, খরচও বেড়ে যায় অনেকটা। এছাড়া পর্বত অভিযানে সাথে নিতে হয় গাইড, শেরপা, মাল বাহক, কুক। এক-একটা অভিযানে প্রয়োজন হয় প্রচুর উপকরণ, খাবার-দাবার, তাবু, জ্বালানি ইত্যাদি। প্রথম কাজ সেগুলো শৃঙ্গের বেসক্যাম্প বা মূলশিবিরে বয়ে নিয়ে যাওয়া। যেসব শৃঙ্গের বেসক্যাম্পে খুব সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়, সেখানে যাতায়াতের খরচ কম হয়। আবার কিছু কিছু শৃঙ্গে বেসক্যাম্প পৌঁছতে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়। স্বভাবতই সেসব অভিযানের বেসক্যাম্পে পৌঁছতে খরচও বেড়ে যায় অনেকটা। যেসব শৃঙ্গের বেসক্যাম্পের কাছাকাছি মোটর রোড রয়েছে, সেখানে অভিযানের মালপত্র নিয়ে যাবার কাজের বেশিটাই গাড়িতেই সেরে ফেলা যায়। কোন অভিযানের যতটা পর্যন্ত রাস্তায় যাওয়া যায়, সেই পয়েন্টকে আমরা বলি 'রোড হেড'। রোড হেড পর্যন্ত মালপত্র গাড়িতে যায়, সেখান থেকে বেসক্যাম্প পৌঁছতে সাহায্য নিতে হয় স্থানীয় মাল বাহক, ঘোড়া, খচ্চর, ইয়াক, মিউল ইত্যাদির। এক এক জায়গায় এদের চার্জ এক এক রকম। সেজন্যই রোড থেকে বেসক্যাম্পের দূরত্ব বেশি হলে অভিযানের মালপত্র বেসক্যাম্পে বয়ে নিয়ে যেতে মোটা টাকা খরচ হয়।

অভিযানের জন্য শৃঙ্গ বাছাই সদস্যদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। যারা প্রথম পর্বত অভিযানে যাচ্ছে তারা স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত সহজ, কম দুর্গম শৃঙ্গ বেছে নেয় অভিযানের জন্য। একের পর এক অভিযানে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তখন ভাবনায় আসে অপেক্ষাকৃত উঁচু শৃঙ্গ কিংবা টেকনিক্যালি চ্যালেঞ্জিং শৃঙ্গ। অবশ্য এই উঁচু কিংবা টেকনিক্যালি চ্যালেঞ্জিং শৃঙ্গ আরোহণ করার সময় সাথে নিতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ গাইড, শেরপা। তাদের চার্জ অনেকটাই বেশি। সেটা নির্ভর করে তাদের

নন্দাখাত

নন্দাকোট

পঞ্চচুল্লি

কামেট

অরিগামিন

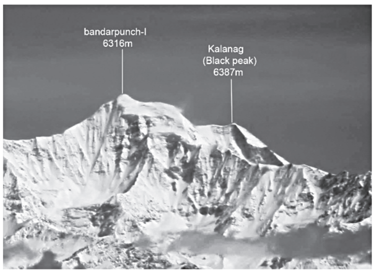

বন্দরপুঞ্চ ও কালনাগ

লিওপারগিল

মনিরাং

দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর। স্বভাবতই সেসব অভিযানের খরচ বেড়ে যায় অনেকটাই। পর্বতারোহণ যারা করতে আসেন সচরাচর তারা খুব স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসেন না। তাই খরচের দিকটা সব সময়েই ভাবতে হয় তাদের। আর পর্বত অভিযানে সাধারণত কোনরকম আর্থিক আনুকূল্য পাবার সম্ভাবনা নেই, কোন স্পনসর সাধারণত পাওয়া যায় না, পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। টাকাটা মূলত পুরোটাই তুলতে হয় নিজেদেরকেই। সেজন্যই খরচ করতে হয় অনেক হিসেব নিকেশ করে। তার ওপর পর্বতারোহণ বেশ খরচসাপেক্ষ এক স্পোর্টস। এখানে মাউন্টেনিয়ারিং বুট থেকে শুরু করে ফেদার জ্যাকেট, ফেদার প্যান্ট, গ্লাভস, সানগ্লাস, এমনকি পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় মোজা কিংবা টুপির দাম সাধারণ জিনিসপত্র থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশি। প্রতিমুহূর্তে পয়সার টানাটানি থাকে বলে পর্বত অভিযানে ঠিক যে ধরনের সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন অনেক সময় আরোহীকে সেখানে আপস করতে হয়। অভিযানে ঠিক যেটা দরকার সেটা কেনার সামর্থ্য থাকে না বলে সেই ধরনের কম দামী কোন জিনিস কিনে সেটা দিয়ে জোড়াতালি মেরে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কোন কোনও সময় এর জন্য মারাত্মক মূল্য চোকাতে হয় তাকে। যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তো থেকেই যায়, এমনকি মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। পর্বতারোহণে সাজসরঞ্জামে আপস করার ফলে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আরোহীর দুর্ঘটনা কিংবা মৃত্যু। এবং এটা শুধু আমাদের চেনা-জানা বাঙালি পর্বতারোহীর ক্ষেত্রেই নয় সারা পৃথিবীর পর্বতারোহীর ক্ষেত্রে এই সব সমস্যা দেখা গেছে। সারা পৃথিবীতে যারা পর্বতারোহণে আসেন তাদের বেশিরভাগই সচরাচর খুব স্বচ্ছল পরিবার থেকে আসেন না। বিখ্যাত পোলিশ পর্বতারোহী কুকুজকা (Jerzy Kukuczka) যাকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক পর্বতারোহী, যিনি অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেছেন, তারও কিন্তু পর্বতারোহণের দামি সরঞ্জাম কেনার পয়সা ছিল না। পুরনো জিনিসপত্র এর তার কাছ থেকে চেয়েচিন্তেই তিনি আরোহণ করেছিলেন একের পর এক দুর্গম শৃঙ্গ। কিন্তু একদিন তাকে এর মাশুল চোকাতে হয়েছিল নিজের জীবন দিয়ে। একটা পুরনো দড়ি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন লোৎসে অভিযানে। কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আশঙ্কা করা

পর্বতারোহনের সরঞ্জাম

হয় সেই দড়ি ছিঁড়ে তিনি হারিয়ে গিয়েছেন পাহাড়ের কোন অতল গহ্বরে।

ভারতীয় হিমালয়ের যে বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গের নাম আমি আগে করেছি আরোহণের কাঠিন্য বা দুর্গমতায় তাদের সবাইকে একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন পর্বত অভিযানে শুধুমাত্র

ইউনাম

ফ্লুটেড

সতোপন্থ

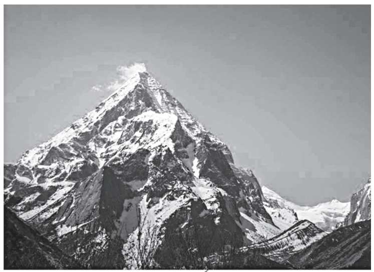
সুদর্শন

নুন

মেরু

শিবলিঙ্গ

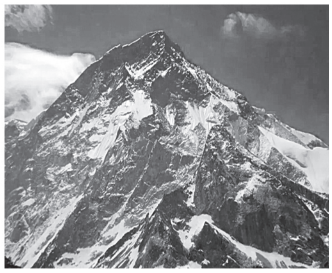
চ্যাঙ্গাব্যাং

উচ্চতা দেখেই তার দুর্গমতা আন্দাজ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে ইউনাম, ফ্লুটেড, স্টক কাংরি কিংবা কালানাগ বা ব্লাক পিক, বালজুরি এসব শৃঙ্গগুলো আরোহন তুলনামূলকভাবে বেশ সহজ। অনেক পর্বতারোহীরা এই ধরনের শৃঙ্গগুলোকে ট্রেকিং পিকও বলে থাকেন। ট্রেকিং যার বাংলা মানে পর্বত-পদচারণ অর্থাৎ সেরকম কোন কারিগরি সরঞ্জাম বা টেকনিক্যাল ইকুইপমেন্টের ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ ছাড়াই শুধুমাত্র হেঁটে উচ্চতায় উঠে যাওয়া। এসব শৃঙ্গগুলো পর্বতারোহী মহলে ট্রেকিং পিক হিসাবে পরিচিত হলেও প্রায় ট্রেকিং করতে করতেই এই শৃঙ্গগুলির শীর্ষে আরোহণ করা যায়। অপরদিকে সতোপন্থ, শমেট, সুদর্শন, নুন, কুন, লিবা এই ধরনের শৃঙ্গগুলোর শীর্ষে আরোহণ বেশ কঠিন। কোন কোন শৃঙ্গের পথ অনেক লম্বা, কোন কোনও গুলো টেকনিক্যালি চ্যালেঞ্জিং। এসব শৃঙ্গে আরোহণের আগে প্রত্যেক সদস্যের যথেষ্ট দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। সঙ্গে সাহায্যের দরকার পড়বে অভিজ্ঞ গাইড, শেরপার। কিছু কিছু শৃঙ্গ যেমন, মেরু, শিবলিঙ্গ, খলয়সাগর, চ্যাঙ্গাব্যাং—এরা এতটাই কঠিন যে, ভারতবর্ষের মাত্র দু-এক জন আরোহীই সাহস করবে সেসব শৃঙ্গে চড়ার মানসিক জোর দেখাতে। আমাদের আরোহণের ইতিহাস দেখলেও তার একটা অনুমান পাওয়া যাবে। আরোহণের পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে অসংখ্যবার আরোহণ হয়েছে কালা নাগ, কেদারডোম, থারকোট, বন্দর পুঞ্ছ, ইউনাম, থেলু, গঙ্গোত্রী, যোগিন, কালিন্দী, কোটেশ্বর, স্টক কাংরি ইত্যাদি শৃঙ্গ। সেখানে মেরু কিংবা থলয়সাগার আরোহণের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। তবে অভিজ্ঞ পর্বতারোহীরা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বেশকিছু দুর্গম পর্বতের দিকে বারেবারে ছুটে যান। পরিসংখ্যান দেখলে দেখা যাবে কামেট, নন্দাদেবী ইস্ট, শিবলিঙ্গ, ত্রিশূল, পঞ্চুচুল্লী, ভাগীরথী, সতোপন্থ প্রভৃতি শৃঙ্গগুলো আরোহণ করতে অসংখ্যবার ছুটে গেছে আরোহীরা।

পর্বতারোহণে আরোহীদের প্রতিমুহূর্তে নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিতে হয়। আমরা সাধারণত প্রায় সমুদ্রতল নিবাসী, সেখান থেকে গিয়ে ওই উচ্চতার শৃঙ্গের মাথায় চড়া সত্যিই এক দুরূহ কাজ। একজন সুস্থ মানুষ মোটামুটি হিসাবে প্রায় দশ হাজার ফুট বা তিন হাজার মিটার পর্যন্ত সাধারণত কোনরকম শারীরিক অসুবিধা অনুভব করে না। কিন্তু তার উপর উঠলে উচ্চতাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। উচ্চতার সাথে সাথে বাতাসে অক্সিজেনের ঘনত্ব কমতে থাকে, সাথে সাথে বাতাসের চাপ একই হিসাবে কমতে থাকে, আর বাড়তে থাকে ঠান্ডার প্রকোপ। এই বাধাগুলোকে প্রতিমুহূর্তে অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ নিতে হয় আরোহীদের। যার শরীর যত বেশি পরিমাণে এবং যত তাড়াতাড়ি এই বাধাগুলোকে মানিয়ে নিতে পারবে, সে পাহাড়ে ততবেশি ফিট থাকবে। এছাড়াও উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও ব্রেনে অক্সিজেন কম যাওয়ার জন্য কতগুলো সমস্যা আমরা অনুভব করি। এক, খিদে চলে যাওয়া কিংবা খাবার ইচ্ছা না থাকা, আর দুই, যথাযথ ঘুম না হওয়া। তবে শরীর যদি উচ্চতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয় তাহলে ধীরে ধীরে এই সমস্যাগুলো আরোহীরা কাটিয়ে উঠতে পারে। দেখা যায় পাহাড়ে একজন ফিট বা সুস্থ থাকবে তখনই যখন তার ঠিকমতন খাওয়া, ঘুম ও প্রাতঃকৃত্য এই কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে হয়। এর কোন একটা সমস্যা হলে, সে ভালো আরোহী হতে পারবে না। কারণ কোন একটা ছোট পর্বতারোহণে অন্তত ২০ থেকে ২২ দিন সময় লাগে। আর বড় পর্বতশৃঙ্গ হলে সেটা এক মাসের বেশি লাগতে পারে। আট হাজার মিটারের উপরের শৃঙ্গগুলো আরোহণ করতে তো প্রায় দু মাস সময় লেগে যায়। সুতরাং এই দীর্ঘ সময় যথোপযুক্ত খাওয়া, ঘুম কিংবা পেট পরিষ্কার না হলে অল্প সময়েই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন সেই দুর্গমতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য যে অদম্য মানসিক ও শারীরিক জোর এবং একশ শতাংশ সুস্থতা প্রয়োজন সেটা তার থাকবে না। দুই-একদিনের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তখন তাকে নিচে নামিয়ে আনা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

লেখক এভারেস্ট সহ সাতটি আট হাজার অধিক উচ্চতার শৃঙ্গবিজয়ী, অর্জুন বিজেতা, সমাজসেবক এবং অনেকগুলি বইয়ের রচনাকারি।

email: icondeba4@gmail.com • M. 8902199900

ডাঃ শঙ্করকুমার নাথ

বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার : কেমন ভাবে তার উচ্চতা মাপা হল

এভারেস্ট

রাধানাথ শিকদার

"ঐ যুবকের গুণাবলি এবং যোগ্যতা অতি উচ্চমানের। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই কম বলা হয়ে যাবে। গণিতবিদ্যায় তাঁর অধিগত বিদ্যা এতটাই যে, তাঁর সমকক্ষ হবার মত ব্যক্তি ভারতে অতি অল্পই রয়েছে, সে ইউরোপীয় হন অথবা এদেশীয় হন। এমনকি ইউরোপেও তাঁর এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা অতি উচ্চমার্গের বলে বিবেচিত হবে। একজন গণক (Computer) হিসেবে সে একেবারেই ক্লান্তিহীন এবং গণিতের বিভিন্ন ফর্মুলাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মত এতটা দক্ষ ব্যক্তি আমার বিভাগে কেউ নেই...।"

এতক্ষণ উপরোক্ত কথাগুলি যিনি বলছিলেন, তাঁর নাম জর্জ এভারেস্ট এবং তিনি যাঁর সম্পর্কে বললেন, তিনি হলেন রাধানাথ শিকদার।

রাধানাথ ছিলেন জর্জ এভারেস্টের চোখে এদেশের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, অন্তত তাঁর আমলে। তাই সার্ভে বিভাগে অর্থাৎ গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে তিনি এভারেস্টকে গুরু বলে মেনে নিতে একমুহূর্ত দেরি করেননি। হিন্দু কলেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। একবেলা খাবার জুটলে আরেক বেলা কি খাবে, তা ছিল অনিশ্চিত অথচ গণিতসাধনায় তাঁর মেধা ছিল অকল্পনীয়। আমরা জানি, প্রতিভা, দক্ষতা, মেধা দেশ-কাল- পাত্র ছাড়িয়ে গরিব-ধনী, তথাকথিত উচ্চজাত-নিম্নজাত, সম্প্রদায় কিছুই মানে না। জন্মগত গণিত প্রতিভা নিয়ে রাধানাথ জন্মেছিলেন কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকায়। তাইতো তিনি এবং তাঁর সহপাঠি রাজনারায়ণ বসাক এই দুজনাই প্রথম ভারতীয়, যাঁরা আইজ্যাক নিউটনের প্রিন্সিপিয়া পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষকমশাই জন টাইটলারের বদান্যতায়। রাধানাথের প্রতিটি কর্মকান্ড, উদ্ভাবনী কীর্তি সার্ভে জগতে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে ভারতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

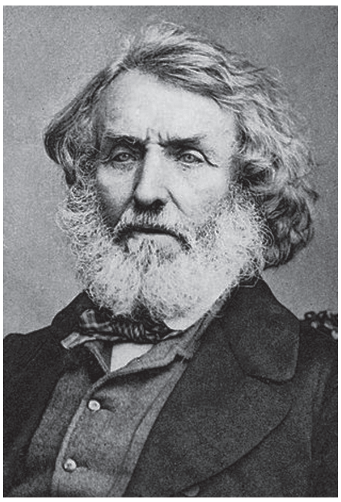

জর্জ এভারেস্ট

রাধানাথ কলকাতাতেই সার্ভে অফিসে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর। হ্যাঁ, দারিদ্র-মোচনে তাঁর এই মাসিক ৩০ টাকা বেতনের চাকরিটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

তারপর ৬ মাস পরে যোগ দিলেন দি গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে ১৮৩২ সালের ৭ মে। তাঁর বেতন হল ১০৭ টাকা প্রতি মাসে। এই সময় তাঁর পদটি ছিল তৃতীয় শ্রেণির সাব-অ্যাসিসট্যান্ট সার্ভেয়র। অল্পকালের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হলেন একই পদে, বেতন বেড়ে হল ১৪০ টাকা। অনেক পরে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে বেতন হয়েছিল মাসিক ১৭৩ টাকা। ১৮৩২ সালের ১৫ অক্টোবর তিনি বদলি হয়ে গেলেন মুসৌরীতে, উদ্দেশ্য জর্জ এভারেস্টের বিশ্বখ্যাত কর্মকান্ড 'The Great Arc'-এর কাজে যুক্ত হওয়া। তবে ১৮৩২-এর আগে কলকাতায় চাকরি করার সময় বি.টি. রোডের ধারে দি গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভের যে-দুটি ৭৫ ফুট উঁচু টাওয়ার রয়েছে, ৬.৫ মাইল বা ১০.৪ কিমি তফাতে সার্ভের মাপজোকের জন্য, সেখানেই তিনি কাজ করেছিলেন।

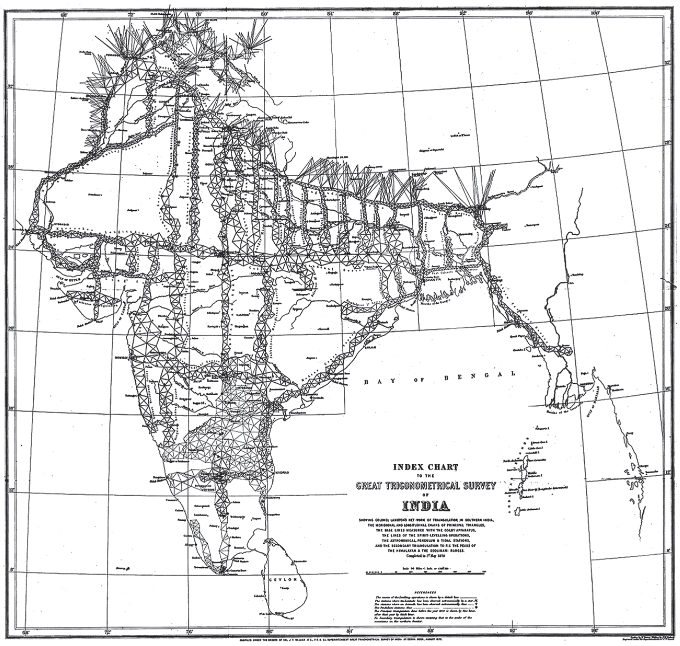

দি গ্রেট আর্ক

মুসৌরী বা দেরাদুনে কাজ করার সুবাদে এভারেস্টের সাহচর্যে রাধানাথের বুদ্ধিমত্তা, সৃষ্টিশীলতা অনেক বেশি চর্চিত হয়েছিল। 'The Great Arc'-এর মত 'One of the most stupendous works in the whole history of science'-এর কর্মকান্ডটি সম্পূর্ণ শেষ হয় ১৮৪৩ সালে। এই কাজ শেষ করেই জর্জ এভারেস্ট অবসর নিয়ে লন্ডনে চলে যান। এখানে পরবর্তী সব কাজের জন্য রেখে যান তাঁর নয়নের মণি সব ছাত্রদের; তাঁদের অন্যতম তিনজন হল রাধানাথ শিকদার, সৈয়দ মীর মহসীন এবং অ্যান্ড্রু স্কট ওয়া। ১৮৪৩ সালে ওয়া সাহেব সার্ভেয়র-জেনারেলের পদে বৃত হন।

১৮৪৫ সালে শুরু হল হিমালয় পর্বতমালার ৭৯টি পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা পর্যবেক্ষণের কাজ। বেশ কিছু সার্ভেয়র-বিজ্ঞানী এই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই মাপজোকের কাজটি শেষ হয় ১৮৫০ সালে। যে ৭৯টি শৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপণ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৩১টি শৃঙ্গের স্থানীয় নাম ছিল আর বাকিগুলিকে রোমান অক্ষরের সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হত। আর সেই নিয়মেই নামহীন ভবিষ্যতের এভারেস্ট শৃঙ্গটির নম্বর ছিল ১৫ বা Peak XV।

সাধারণভাবে ত্রিকোণমিতির ফর্মুলাগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গগুলির উচ্চতাগুলিকে মাপা হত। তবে এই উচ্চতা নিরূপণের বিষয়টি এত সহজ তো ছিলই না বরং বলা ভাল বেশ জটিল ছিল। সমুদ্র পৃষ্ঠতলের উপর থেকে উচ্চতা মাপার মধ্যেও ছিল কঠিন সব অঙ্ক (বর্তমানে অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে এসব অনেকটাই সহজ হয়েছে)। এরপরও রয়েছে বাতাসের ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে প্রতিসরণের ত্রুটি অথবা শৃঙ্গের উপর বরফ জমা এবং ঋতুভেদে গলে যাওয়ার সঙ্গে শৃঙ্গের উচ্চতারও হেরফের হওয়া, এসবই সেযুগে প্রধান গণককে পরিমার্জন করতে হত, হিসেবের মধ্যে রাখতে হত, নইলে শৃঙ্গের সঠিক উচ্চতা মাপা সম্ভব হত না।

এই প্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালে সার্ভে অফিসের অত্যন্ত মানীগুনী অফিসার (পরে সার্ভেয়র-জেনারেল হয়েছিলেন) সিডনী জেরাল্ড বুরার্ড 'The heights of Himalayan Peaks' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে লিখেছেন :

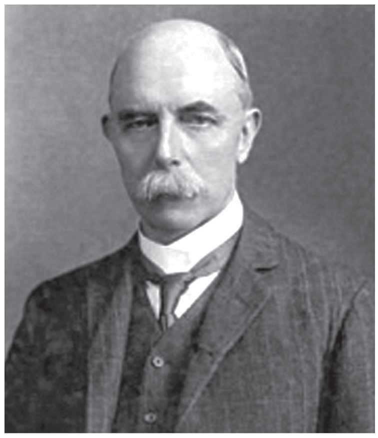
এস. জি. বুরার্ড

"হিমালয় পর্বতমালা এবং সীমান্তবর্তী এলাকার যেসব শৃঙ্গগুলি অবস্থান করছে, তাদের উচ্চতা নিয়ে কঠিন সব প্রশ্ন উঠেছে : এইসবের উচ্চতার মাপজোকে ত্রুটি পাওয়া গেছে— কেননা প্রথমত, যেখান থেকে শৃঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয় সেই পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলগুলি অত্যন্ত বন্ধুর বা অসমান; দ্বিতীয়ত, প্রতিসরণের সূত্রগুলির বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা, আসলে বিকিরণগুলি বরফ-আচ্ছাদিত শৃঙ্গগুলির সন্নিহিত তনুভূত বায়ুর মধ্য দিয়ে গমন করে; তৃতীয়ত, বরফের বৃদ্ধি এবং হ্রাসপ্রাপ্ত হবার কারণে যে শৃঙ্গগুলির উচ্চতার পরিবর্তন ঘটে, সে-সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা।

সুতরাং, এটি এখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কার্যক্রমের বিষয় যে, অতি-উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতে প্রতিসরণের সূত্রগুলি কেমন, তা খোঁজ নেওয়া এবং শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ঠিক কতটা পরিবর্তিত হয়, তা মেপে দেখা।"

কিন্তু উচ্চতা-নিরূপণের যে বেসিক সরল ত্রিকোণমিতি, তা হল এইরকম :

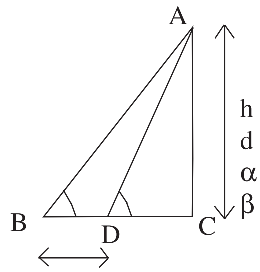

AC (h) = পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা।

পর্যবেক্ষক B থেকে থিওডোলাইট ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে চূড়া (A) পর্যবেক্ষণ করে ভূমির (BC) সঙ্গে উৎপন্ন হওয়া কোণ α মাপলেন, তারপর তিনি B থেকে পর্বতের দিকে এগিয়ে গেলেন d দূরত্ব D পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার চূড়া পর্যবেক্ষণ করলেন এবং ভূমির (DC) সঙ্গে তৈরি কোণটি মাপলেন, যা β। যেহেতু ΔABC এবং ΔADC উভয়ই সমকোণী ত্রিভুজ, তাই ত্রিকোণমিতির সূত্র অনুযায়ী ঃ

$$d = h\ (\cot\alpha - \cot\beta),$$
$$\therefore\ h = \frac{d}{\cot\alpha - \cot\beta}$$

এখানে d, $\cot\alpha$, $\cot\beta$ সবই জানা। তাহলে h অর্থাৎ পর্বতচূড়ার উচ্চতা পাওয়া গেল।

যত সহজে একটি ত্রিকোণ- মিতির সূত্র উল্লেখ করে পাহাড়শৃঙ্গের

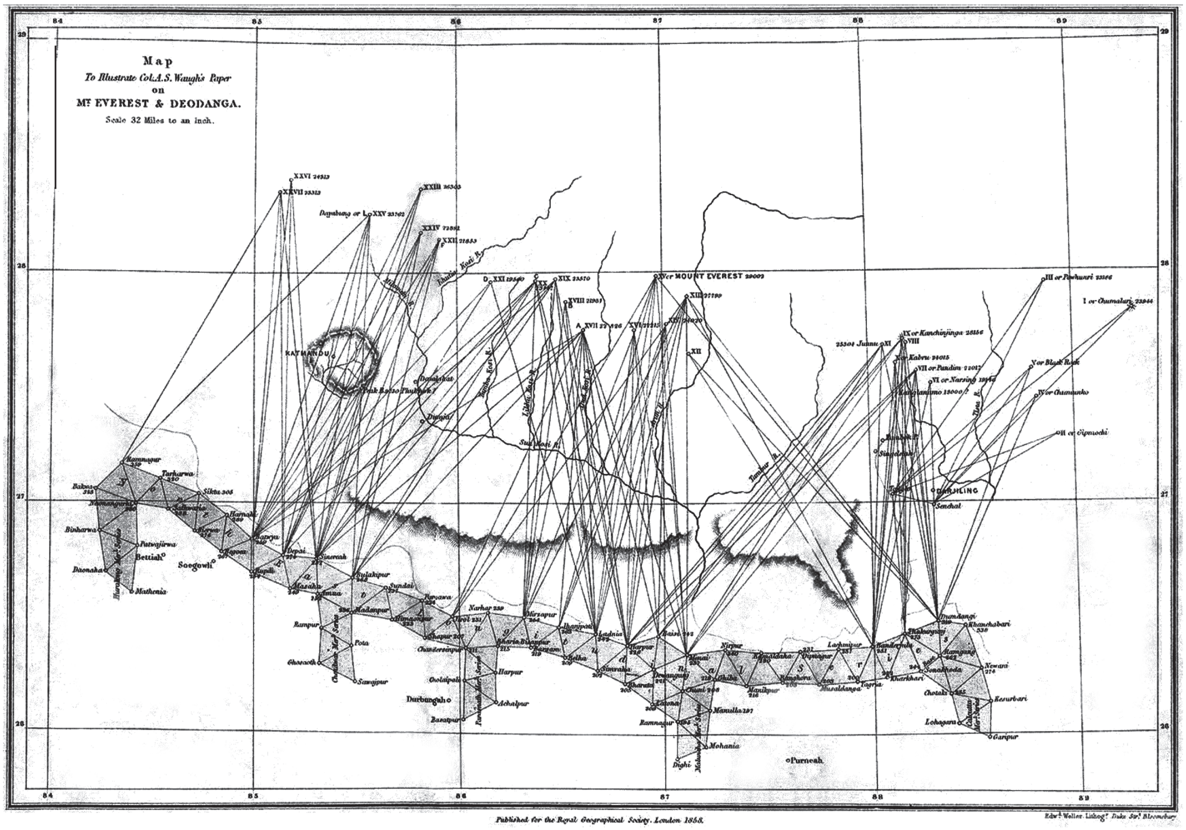

১৮৫৮ সালে নির্মিত প্রথম সার্ভে মানচিত্র

উচ্চতা মাপার কথা বললাম, ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ ছিল না সে-যুগে।

নিখুঁতভাবে পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা মাপাটার মধ্যে রয়েছে প্রচুর আঙ্কিক জটিলতা, যা আগেই বলেছি। তবে ঐ সময়ে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলিকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং কিভাবে উচ্চতা সম্পর্কে মাপজোকগুলি করা হয়েছিল, তার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা জানিয়েছিলেন বুরার্ড সাহেব 'নেচার' পত্রিকায় ১৯০৪ সালে, ১০ নভেম্বর সংখ্যায় :

"প্রথম ধাপ — মানচিত্রের উপর পর্যবেক্ষণের স্টেশনগুলিকে সযত্নে নির্দিষ্ট করা এবং প্রতিটি স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এমন সমস্ত শৃঙ্গগুলির অভিমুখে লাইন টেনে দেওয়া।

দ্বিতীয় ধাপ — যখন তিন বা তার অধিক স্টেশন থেকে অভিমুখ-লাইনগুলি একটি বিন্দুতে এসে মিলবে, তখন ধরে নিতে হবে যে, এই শৃঙ্গকে তিন বা তার অধিক স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপ — ত্রিকোণমিতির ফর্মুলাগুলির সাহায্য নিয়ে প্রতিটি পর্যবেক্ষণ-স্টেশন থেকে ঐ নির্দিষ্ট শৃঙ্গটির দূরত্ব পরিমাপ করা হল। এবং এই দূরত্বগুলি থেকে আলাদা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট শৃঙ্গটির অক্ষাংশ (Lattude) ও দ্রাঘিমাংশ (Longitude)-এর মাপ পাওয়া গেল। যদি সব মাপগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে খোঁজার কাজটি চলতে থাকল।

চতুর্থ ধাপ — পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি স্টেশন থেকে পরিমাপ করা নির্দিষ্ট শৃঙ্গের উন্নতি কোণ এবং দূরত্বের সাহায্যে শৃঙ্গটির উচ্চতা পরিমাপ করা হল। এইভাবে প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণ স্টেশন থেকে নির্দিষ্ট শৃঙ্গের আলাদা উচ্চতার মাপ পাওয়া গেল। যদি এইভাবে প্রাপ্ত উচ্চতার অনেকগুলি মাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে বেশকিছু শৃঙ্গকে একবার বা দুবার পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, তাই নির্দিষ্টকরণ করা যায়নি। আবার অনেকগুলির ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সন্তোষজনক ছিল না, তাই সেগুলিকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।"

ভারতে যেখানে যত জরিপকাজ সেই সময় হচ্ছিল, সব তথ্য, হিসেবপত্তর, গাণিতিক মাপ, ডায়াগ্রাম ইত্যাদি সবই এনে জমা করা হত কলকাতায় রাধানাথের কাছে; কেননা রাধানাথ দেরাদুন থেকে ১৮৪৯ সালে কলকাতার সার্ভে অফিসে বদলি হয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি প্রধান গণক বা Chief Computer পদে বৃত। আর এই জন্যই সার্ভেয়র জেনারেল ওয়া সাহেব দেরাদুন থেকে প্রধান গণনা বিভাগটিও দেরাদুন থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে দেন রাধানাথের বদলির জন্যই। জরিপের সেইসব হাজার হাজার তথ্যগুলি নিয়ে জটিল সব গাণিতিক গণনার মাধ্যমে মূল নির্যাসটুকু বার করে আনতেন রাধানাথ আর সেটাতেই পড়ত চূড়ান্ত সরকারি সীলমোহর। হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গগুলি জরিপের সঙ্গে বহু জরিপবিদ যুক্ত ছিলেন। এটি ছিল আর

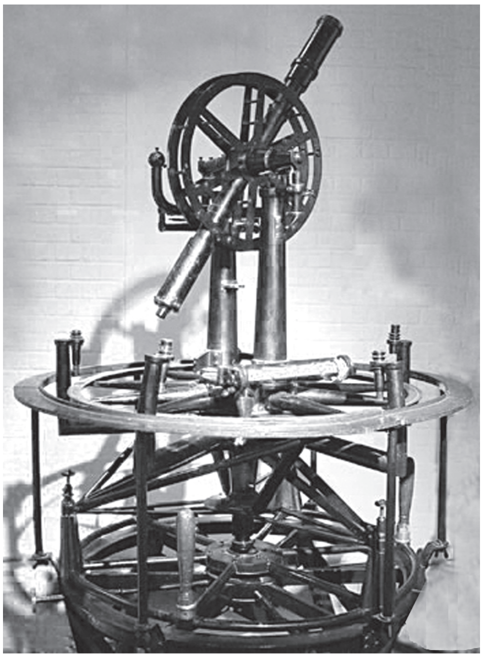

জর্জ এভারেস্টের ব্যবহৃত গ্রেট থিওডোলাইট

একটি বিরাট কর্মকান্ড, যুক্ত ছিলেন লোগান সাহেব, জন আর্মস্ট্রং, জন পিটন, নিকলসন ও আরও অনেকে। এমনকি ছিলেন সার্ভেয়র-জেনারেল ওয়া সাহেব নিজেও। আমরা এখানে দেখে নেবো, জেমস্ অক্টারলোনী নিকলসনের পর্যবেক্ষণজাত কাজকর্ম।

জে.ও. নিকলসন ১৮৪৯ সালের ৩ নভেম্বর পাটনার উত্তরে মদনপুর থেকে ১২ ইঞ্চি থিওডোলাইট যন্ত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করেন। পরে তিনি ২৭ নভেম্বর জিরোল স্টেশনের পূর্বদিক থেকে বরফ-শৃঙ্গকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আর্মস্ট্রং-এর a এবং b নাম দেওয়া বরফশৃঙ্গগুলি নথিভুক্ত করেন। নিকলসন সমস্ত পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ করেন ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসে। ১০০ মাইলেরও অধিক দূরত্ব থেকে শৃঙ্গ-১৫-কে ছটি বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করে ঐ ১৫ নম্বর শৃঙ্গের গড় উচ্চতা দেখান ২৯০০২.৩ ফুট। তিনি কিন্তু জানতেন না, এটিই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

আমরা দেখে নিই ১৮৪৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত নিকলসন সাহেব ১৫ নম্বর শৃঙ্গ (পরবর্তীকালে এভারেস্ট শৃঙ্গ) পর্যবেক্ষণ করে কী তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

Trangulation Station	Distance from Mount Everest	Number of observation	Dates of observation	Calculated Elevation corrected for Refraction (ft.)
Jirol	118.661	2	27 Nov. 1849	28,991.6
Mirzapur	108.876	12	5, 6 Dec. 1849	29,005.3
Janjapati	108.362	4	8, 9 Dec. 1849	29,001.8
Ladnia	108.861	4	12 Dec. 1849	28,998.6
Harpur	111.523	8	17,18 Dec.1849	29,026.1
Minai	113.761	8	17 Jan. 1850	28,990.4
			Mean :	29,002.3

এইরকম হাজার হাজার তথ্য নিয়ে রাধানাথকে কলকাতার অফিসে বসে উচ্চতা নিরূপণের জটিল এবং কঠিন সব হিসেব করতে হত প্রতিদিন। যাঁরা ফিল্ডে পর্যবেক্ষণ করতেন, তাঁদের দেওয়া তথ্যের পরও থাকত নানান সংশোধন, পরিমার্জন, পুনর্গণনা ইত্যাদি। আর সেই পাহাড়-প্রমাণ কাজগুলিই করেছিলেন রাধানাথ শিকদার।

সময়টা ১৮৫২ সাল। রাধানাথ এই সমস্ত গাণিতিক হিসেবগুলি চূড়ান্ত করে যখন নিশ্চিত হলেন যে পনেরো নম্বর শৃঙ্গটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ (২৯০০২.৩ ফুট), তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর তৈরি হিসেব-পত্তর, ডকুমেন্টস্ ফাইলবন্দি করে দেরাদুনে তৎকালীন সার্ভেয়র-জেনারেল অ্যান্ড্রু ওয়াকে পাঠিয়ে দিলেন আর ওরই মধ্যে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা সবিস্তারে লিখে পাঠালেন। ওয়া সাহেব রাধানাথের কাগজপত্তর পেয়ে বিস্মিত হলেন, চমৎকৃত হলেন, চোখ বুলিয়ে বুঝলেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কারের হিসেবে রাধানাথের কোথাও ভুল নেই। তবুও তিনি আরও নিশ্চিত হবার জন্য দেরাদুনে যে-কয়েকজন গণক ছিলেন, বিশেষ করে জন হেনেসি, তাঁকে নির্দেশ দিলেন রাধানাথের এই হিসেবপত্তরগুলিকে পুনর্গণনা করে দেখার।

সেযুগে ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ রাধানাথ শিকদারের হিসেবে কোন ভুল থাকার কথা নয়, ভুল ছিলও না। তবুও পুনর্গণনা করে করে চার বছর পর নিশ্চিন্ত হয়ে ১৮৫৬ সালে ওয়া সাহেব জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন যে, Peak XV বা পনেরো নম্বর শৃঙ্গটিই হল বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই ঘোষণাটি করা হয়েছিল কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮৫৬ সালের ৬ আগস্টের এক সভা থেকে। সেখানে অবশ্য ওয়া সাহেব উপস্থিত ছিলেন না, অনুমান, ছিলেন না রাধানাথও (যদিও রাধানাথ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যপদ পেয়েছিলেন ১৮৫৩ সালে)। ওয়া-র হয়ে ঘোষণাটি করেছিলেন তাঁর ডেপুটি—মেজর থুইলিয়ার সাহেব। মিনিটস্-এ যা লেখা হল, তার অর্থ দাঁড়াল এইরকম—জনগণকে জানানো হচ্ছে, ওয়া সাহেবের নেতৃত্বে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি আবিষ্কৃত হল।

রাধানাথ শিকদারের নাম সচেতনভাবে উচ্চারিত হল না। এই আবিষ্কার ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভেতে কর্মরত সকলে আবিষ্কার করেছেন বললেও খানিকটা সত্যতা থাকত কিন্তু এরপর থেকেই তৎকালীন পত্র-পত্রিকাতে লেখা হতে লাগল যে, ওয়া সাহেব পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কার করেছেন। বলাবাহুল্য, এও এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি।

১১ মে এবং ২৫ মে, ১৮৫৭ সালে দুদিন সভা বসলো লন্ডনের রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে। সভার সভাপতি ছিলেন রোডেরিক আই. মুর্চিসন। ১১ তারিখের সভায় বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বিষয়ে একটি বড় গবেষণাপত্র পড়ে শোনালেন কর্নেল ওয়া। সেখানে তিনি বললেন, “I have determined to name this noble peak of the Himalayas ‘Mont Everest’.” অর্থাৎ জর্জ এভারেস্টের নামে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গটির নামকরণের প্রস্তাব রাখছি। পরে অবশ্য Mont নয় Mount Everest নামে তা জনপ্রিয় হয়ে যায়। সভায় নামকরণ

বি টি রোড পাইকপাড়া জি টি এস টাওয়ারের কাছে সার্ভের কাজ চলছে

বিষয়ে বি. এইচ. হজসন একটা মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু তা নস্যাৎ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। জর্জ এভারেস্ট সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে যখন বলতে বলা হয়, তিনি কর্নেল ওয়া-কে 'বন্ধু' সম্বোধন করে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেন :

> "কর্ণেল ওয়া যে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নামকরণ আমার নামে করবেন, তা আমার ধ্যান-ধারণাতে ছিল না। আমি ভারতীয় জরিপ বিজ্ঞানীদের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, এঁদের মধ্যে দক্ষ জরিপ বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই জরিপ বিভাগে পালিত হয়েছেন এবং শিক্ষিত হয়েছেন, সত্যি বলতে কি, আমার কাছেই; ব্যক্তিগতভাবে এজন্য আমার কাছে অনেকে ঋণী। তাসত্ত্বেও আমি অবশ্যই স্বীকার করবো, এই পর্বতশৃঙ্গটির আমার নামে নামকরণ করার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। প্রথমত, ভারতের একজন অধিবাসীও আমার নামটি ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারবে না, এমনকি আমার নামটি পার্সিয়ান কিংবা হিন্দিতে লেখা পর্যন্ত যাবে না..."

সুতরাং এই বিশাল আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু এভারেস্ট, ওয়া এবং তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গরা ভাগাভাগি করে নিলেন। আর ঐ দুষ্ট খেলার মধ্যে রাধানাথ শিকদার একেবারে হারিয়ে গেলেন। মূল আবিষ্কারক রাধনাথের নাম জানা গেল না। ১৮৫২ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত সব রেকর্ড চাপা পড়ে রইল এদেশের আর বিদেশের Record Room-এর অন্ধকারে।

সেই ১৯০৪ সালে এস. জি. বুরার্ড সাহেব প্রখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা Nature-এ পরোক্ষে জানিয়ে দিলেন, রাধানাথ শিকদারই বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কর্তা। বুরার্ড সাহেবের এই গবেষণাপত্রটির নাম ছিল "Mount Everest : the Story of a Long Controversy", Nature পত্রিকার ১০ নভেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেই তিনি রাধানাথের পক্ষ নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন। এই প্রথম পৃথিবীর সামনে এসে গেল বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কারক Chief Computer রাধানাথ শিকদারের নাম। বুরার্ড সাহেব গবেষণা করে লিখলেন :

> "১৮৫২ সাল নাগাদ কলকাতা অফিসের প্রধান গণক জানালেন অ্যান্ড্রু ওয়াকে, গণনা করে জানা গেল যে, পনেরো নম্বর শৃঙ্গটিই হল পৃথিবীর অন্যান্য সকল শৃঙ্গগুলির চেয়ে উচ্চতায় সর্বোচ্চ। ছয়টি বিভিন্ন স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করে এই শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেছেন গণকগণ। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পর্যবেক্ষক বুঝতে পারেননি যে, তিনি তাঁর টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দুটি দেখছেন।"

অর্থাৎ, কলকাতা অফিসের প্রধান গণক ১৮৫২ সালে স্যার অ্যান্ড্রু ওয়া-কে জানালেন যে, ১৫ নম্বর শৃঙ্গটিই পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত মাপা সব শৃঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই শৃঙ্গটি গণকেরা ছটি বিভিন্ন স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করেছেন; কিন্তু তাঁরা কখনই আন্দাজ করতে পারেননি যে, তাঁরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানটি দেখছেন টেলিস্কোপের মাধ্যমে।

সুতরাং রাধানাথ শিকদারই যে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কারক, তা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হল ১৯০৪ সালে।

বাংলার এই অন্যতম বিজ্ঞান সাধক রাধানাথ শিকদারের জীবনাবসান হয় ১৮৭০ সালের ১৭ মে, চন্দননগরের বাড়িতে।

লেখক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও বিজ্ঞান লেখক।
email: sankarku_nath@yahoo.co.in • M. 9433309056

শমীক দে

হিমালয়ের কৃষি ও পশুপালন

কুমায়ুন অঞ্চলের কৃষি ছবি : তাপস মজুমদার

ভারতবর্ষ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে হিমালয় পর্বতমালা ও তার পাদদেশ সংলগ্ন বসবাসকারী মানুষ কৃষি ও পশুপালন-এর উপর নির্ভরশীল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের কাছে চিরাচরিত ভাবেই কৃষি ও প্রাণী পালন একটি পারিবারিক অভ্যাস। এর ওপরে ভিত্তি করেই এখানকার মানুষ বেঁচে রয়েছে।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা

সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রধানত চার ধরনের কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে।

১. বৃষ্টি নির্ভর ফসল ও পশুপালন মিশ্র খামার (Rain fed Crop Livestock Mixed Farming System) :

ফসল বলতে প্রধানত ধান, গম ও ভুট্টা এখানে চাষ হয়। পশ্চিম হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে (উত্তরাখণ্ড, কাশ্মীর) ধান, গম, ভুট্টা ছাড়াও বাজরা, বার্লি, ডাল শস্য ও তৈলবীজের চাষ ব্যাপকহারে হয়ে থাকে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে (নেপাল) ধান প্রধান খাদ্যশস্য। ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা, আলু ও আখ ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে (সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ) কৃষি ব্যবস্থায় বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। ধান এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যশস্য এবং সমগ্র কৃষিজমির ৮০ শতাংশ ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। এ অঞ্চলে মিশ্র চাষ (Mixed Farming) একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই ধরনের মিশ্র খামারে ৮-১০ রকমের ফসল যথা ধান, গম, ভুট্টা, বার্লি, ডালশস্য ও বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। পশুপালন এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এক সমীক্ষায় জানা যায় সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে সর্বমোট গবাদি পশুর (গরু ৪৭ শতাংশ, মোষ ১২.৩ শতাংশ, ভেড়া ১০.৭ শতাংশ, ছাগল ১৫.৮ শতাংশ) সংখ্যা ৫০০ লক্ষ-এর কাছাকাছি। মধ্য ও পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে প্রধানত গরু-মোষ, ভেড়া ও ছাগলের চাষ পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র ভারতে সর্বমোট শুকরের সংখ্যার ২৩ শতাংশ সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। গরু-মোষের ক্ষেত্রে দেশি জাতের (গির, থারপরকার) পাশাপাশি সংকর জাতের (জার্সি, হলস্টেইন) চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ছাগল ও ভেড়ার ক্ষেত্রে মূলত দেশি প্রজাতির চাষ হয়। উপযুক্ত চারণভূমির থাকার জন্য ছাগল ও ভেড়ার চাষ এখানে বেশি হয়। গ্রীষ্মকালে পার্বত্য অঞ্চলের বেশি উচ্চতায় এবং শীতকালে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় এরা চড়ে বেড়ায়।

আপেল

কমলালেবু

টমেটো

আর্কিড

সিঙ্কোনা

পিচ

গ্লাডিওলাস

২. উদ্যানপালন ভিত্তিক চাষবাস (Horticulture Based Farming) :

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে বিভিন্ন ধরনের ফল (আপেল, চেরি, কমলালেবু, আনারস, আম, কলা ইত্যাদি), শাকসবজি, (টমাটো, মুলো, আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি ও ব্রকলি ইত্যাদি), ফুল (অর্কিড, গ্লাডিওলাস, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি), বিভিন্ন অর্থকরী ফসল (লঙ্কা, আদা, এলাচ, গোলমরিচ, তেজপাতা, জয়ত্রী, জায়ফল) এবং বিভিন্ন সুগন্ধি ঔষধি গাছ (পটল, জীবক, মাজু, ঋদ্ধি, সিঙ্কোনা ইত্যাদি) চাষের উপযোগী। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফলের (যেমন আপেল, পিচ, পিয়ার, চেরি, আলমন্ড, ওয়ালনাট ইত্যাদি) চাষ হয়ে থাকে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের সমগ্র চাষযোগ্য জমির ১৬ শতাংশে ফল এবং শাকসবজি চাষ হয়ে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে এই ধরনের চাষ খুবই লাভজনক। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদের এই চাষের প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট বেশি। এ অঞ্চলে এধরনের চাষবাস প্রসারের জন্য ভারত সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিবিড় উদ্যানপালন চাষ (Integrated Horticulture Development Programme বা (IHDP) ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

৩. ঝুম চাষ (Jhum Cultivation) :

পার্বত্য অঞ্চলে ঝুম চাষ একটি বহুল প্রচলিত কৃষি পদ্ধতি। এই চাষে প্রথমে জমির সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করা হয়। আগাছা ও অন্যান্য গাছপালাগুলি জমির মধ্যেই পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর জমিটিকে চাষযোগ্য করার জন্য পরপর ধাপ তৈরি করা হয়। এজন্য একে ধাপ চাষ বলা হয়। ধান, গম ও ভুট্টা প্রভৃতি শস্যচাষ করা হয়ে থাকে। ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত একনাগাড়ে চাষ করার ফলে এই জমিগুলির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। জমিটিকে পরিত্যক্ত করে নতুন করে আবার ঝুম চাষের জন্য জমি তৈরি করা হয়। পরিত্যক্ত জমির উর্বরতা ফিরে আসতে ৫ থেকে ২৫ বছর সময় লাগে। এক্ষেত্রে পাহাড়ের বাস্তুতন্ত্রের উপর জমির উর্বরতা নির্ভর করে। বর্তমানে ঝুম চাষের প্রচলন হ্রাস পাচ্ছে। পার্বত্য অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ঝুম চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব এর প্রধান কারণ। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে ধস ও মাটির পুষ্টিগুণ হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে ঝুম চাষের জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।

৪. বনজ-কৃষি (Agro-forestry) :

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের ২০ শতাংশ জমিতে বনজ-কৃষির চাষ করা হয়। পশ্চিম-মধ্য হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের বনজ-কৃষির চাষ লক্ষ্য করা যায়। যেমন

১. কৃষি উদ্যান : কৃষি ও উদ্যান পালন একসাথে চাষ (Agri Horticulture)

২. বনজ চারণ জমি : বনের ভিতরে চড়ে বেড়ানোর জমি (Silvi Horticulture)

৩. বন চারণ জমি : বনের ভিতরে জমির চারণ ভূমি (Silvi Pastoral)

এক সমীক্ষায় জানা যায় একক ফসল চাষের তুলনায় বনজ-কৃষি ও উদ্যান চাষ অনেক বেশি লাভজনক। কারণ এই চাষের মাধ্যমে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য বেশ কিছু চাহিদা খাবার-দাবার, বস্ত্র, বাসস্থান ও ঔষধপত্র পর্যাপ্ত ভাবে পূরণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে পরিবেশবান্ধব নানা ধরনের কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়।

লাদাকে পশুপালন ছবি : কাজল বিশ্বাস

যেমন বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড কম পরিমাণ নির্গত হয়। গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন (যথা, মিথেন, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড) সালফার ডাই অক্সাইড ইত্যাদি হ্রাস পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশে যে ক্ষতিগুলো হয়, সেই দিক থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এছাড়া এধরনের চাষে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী পালন খুব লাভজনক। কারণ এই চাষে প্রাণীরা বেশ ভালোভাবে চড়ে বেড়াতে পারে।

উপসংহার

পার্বত্য অঞ্চলের কৃষি ও পশুপালন-এর ক্ষেত্রে বেশকিছু বাধ্যবাধকতা সম্ভাবনাময় ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করতেই হয়। চাষবাসের ক্ষেত্রে যে বাধ্যবাধকতাগুলি পরিচিত হয়, সেগুলি হল—

১. **দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া :** এর ফলে চাষের ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রভূত ক্ষতি হয়।

২. **চাষের প্রতিকূল পরিস্থিতি :** জমির ধস ও একনাগাড়ে প্রচুর বৃষ্টির ফলে চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. **পরিবহন ব্যবস্থা :** পার্বত্য অঞ্চলে চাষের ফসল পরিবহন করা খুবই সমস্যা। এছাড়া সবজি, ফল ও ফুল মজুত রাখার মত সুবিধা (যেমন হিমঘর) থাকে না।

৪. **দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থা :** হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের বেশিরভাগ জনবসতির আর্থিক অবস্থা বেশ দুর্বল। কোন ঝুঁকিপূর্ণ চাষবাস বা কাজ তারা নিজে করতে সক্ষম নয়। এছাড়া নানা ধরনের বিপর্যয়, অতিবৃষ্টি, বন্যা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অপুষ্টি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষকে ঘিরে রেখেছে।

৫. **বিক্ষিপ্ত চাষ :** এর ফলে ক্ষুদ্র চাষিরা ঠিকমত ফল, সবজি ও ফুল উৎপাদন করতে পারে না। জমির পরিমাণ কম এবং জমির ধস একটি বড় কারণ।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের সম্ভাবনাময় সুযোগ সুবিধাগুলি

১. পৃথিবীর মোট জমির ২৪ শতাংশ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল আর পৃথিবীর জীববৈচিত্রের প্রায় ৫০ শতাংশ (Biodiversity Hotspot) সমগ্র হিমালয় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে রয়েছে হাজার হাজার উদ্ভিদ ও প্রাণীকূল (flora & fauna)।

২. হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের পাদদেশে উদ্যানপালন চাষ খুবই ভালভাবে হতে পারে। বিশেষ করে মিশ্র খামার পদ্ধতি অবলম্বন করে। কৃষি, উদ্যান ও পশুপালন বিভিন্ন ধরনের চাষের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এইসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

৩. ফুল ও ফলের চাষ খুবই লাভজনক। সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের চাষ, অর্কিড চাষ, খুবই লাভজনক হতে পারে। এক্ষেত্রে বনজ উদ্যান ও বনজ কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। নিবিড় পদ্ধতির মাধ্যমেও চাষ করা গেলে খুবই লাভজনক। এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে (শীতকালের নভেম্বর থেকে মার্চ) উন্নত মানের বিভিন্ন ধরনের চাষ করা যেতে পারে। একই সাথে গরু, ছাগল ও ভেড়া বিভিন্ন চারণ জমিতে চড়ে বেড়াতে পারবে।

৪. কৃষি ভ্রমণ বা পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ : পাহাড়ে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের পরিবেশবান্ধব কৃষি সহায়ক ভ্রমণ করানোর উপকারিতা রয়েছে। এতে পারস্পরিক জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটবে। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটবে। অর্থনৈতিকভাবেও পাহাড়বাসীরা উপকৃত হবেন।

লেখক সহকারি অধ্যাপক, স্কুল অফ এগ্রিকালচার, জে.আই.এস. বিশ্ববিদ্যালয়
email: deyshamik93@gmail.com • M. 6291320657

অনুপ হালদার

হিমালয়ের পাঁজরভাঙা উন্নয়ন

হিমালয় আমাদের কাছে এক অবাক বিস্ময়। ভারতের উত্তর সীমান্তে দুর্ভেদ্য প্রাচীর-এর মতন দাঁড়িয়ে থেকে একদিকে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশকে মধ্য এশিয়া থেকে ধেয়ে আসা হিমশীতল বায়ুপ্রবাহকে প্রতিহত করে আমাদের দেশের জলবায়ুকে নাতিশীতোষ্ণ করেছে, তেমনি সারা বছর ধরে হিমালয়ে সঞ্চিত বরফ রাশি বা হিমবাহগুলি তৈরি করেছে অজস্র নদী, যা শুধুমাত্র ভারত নয় পাকিস্তান, চিন থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত নানা দেশের কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়ে এসেছে, সেই কোন্ আদি অনন্তকাল ধরে। গোটা এশিয়া মহাদেশ জুড়ে বৃষ্টির যে রাজকীয় ঐশ্বর্য তা এই হিমালয়ের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। যে কারণে ভারতবর্ষকে এককথায় হিমালয়ের দান বলা যেতে পারে। পৃথিবীর দুটি মেরুকে বাদ দিলে হিমালয় একমাত্র স্থান যেখানে এত বরফ জমা রয়েছে। সেই কারণে হিমালয়কে পৃথিবীর তৃতীয় মেরুও বলা হয়। ভৌগোলিকভাবে হিমালয় পর্বত পাকিস্তানের গিলগিটে সিন্ধু নদী থেকে শুরু করে ভারত, তিব্বত, নেপাল, পূর্ব ভারত ও ভুটান হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ অঞ্চলের বাঁক পর্যন্ত বিপুল স্থলভাগ জুড়ে রয়েছে। হিমালয়ের হিমবাহ গলে সৃষ্টি হওয়া নদী বা জলধারাগুলি শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধশালী করেনি, হিন্দুকুশ হিমালয় থেকে প্রবাহিত দশটি বড় নদী যেমন আমু দরিয়া (উজবেকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত), তারিম, ইয়েলে, ইয়াঝে (চিন পর্যন্ত বিস্তৃত), ইরাওয়াড়ি (মায়ানমার পর্যন্ত বিস্তৃত), মেকং নদী (লাওস পর্যন্ত বিস্তৃত), সালাউইন (মায়ানমার হয়ে থ্যলাউইন নামে থাইল্যান্ডে প্রবেশ করেছে)। অর্থাৎ হিমালয়ের আশীর্বাদ-ধন্য এই বিপুল ভূখণ্ডের কোটি কোটি মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদকূল। অথচ এহেন এক বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ আমরা করতে পারিনি। এহেন হিমালয় আজ পরিবেশগতভাবে বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ে বরফ জমাট বাঁধতে পারছে না, ফলে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলির উৎসমুখেই দেখা দিচ্ছে জলাভাব।

বলা যায় আমাদের ক্রমাগত আগ্রাসনের ফলে হিমালয় হারাচ্ছে তার নিজস্বতা। খুব দ্রুত বরফ গলে যাচ্ছে হিন্দুকুশ হিমালয়ের পর্বতগুলিতে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি যদি আর ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখা না যায় তবে হিন্দুকুশ সহ হিমালয়ের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হিমবাহ গলে যাবে। ফলে ওই অঞ্চলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেকং সহ প্রধান ১০টি নদী (আমুদরিয়া, সিন্ধু, গঙ্গা, তারিম, ব্রহ্মপুত্র, ইড়াওয়াড়ি, সালাউইন, মেকং, ইয়াংঝে, ইয়োলো) সহ শত সহস্র নদীর অপমৃত্যু ঘটবে। বদলে যাবে জীববৈচিত্র্য। হিমালয়ের বরফ দ্রুত গলে যাওয়ার ফলে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে বারবার ভয়াল বন্যার সৃষ্টি হবে। পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে ২০৮০ সালের মধ্যে হিন্দুকুশ পর্বতমালার প্রধান নদীগুলি শুকিয়ে যাবে এবং ভারত সহ আরো ৮টি বড় দেশের সমাজ, অর্থনীতি ও জীববৈচিত্র্যের ওপর সমূহ বিপদ নেমে আসবে। হিমালয়ের বিপন্নতার সাথে সাথে বিপন্ন হবে শুধু নদী ও ঝরনা নয়, তার সাথে মিশে থাকা গাছপালা, পশুপাখি, পোকামাকড়, সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যারা আশ্রয় পেয়েছে হিমালয়ের কোলে, তারাও। আর এদের বিপন্নতার সাথে সাথে কয়েক লক্ষ বছর ধরে তৈরি হওয়া আমাদের বিশ্বসংসারের প্রাণশক্তিও নিভে যাবে। যদি গাড়োয়াল হিমালয়ের দিকে তাকাই তবে দেখব, উত্তর কাশীতে ১৯৩১ সালে ঘটে যাওয়া মারাত্মক ভূমিকম্প, ১৯৯৯ সালে চামোলি ভূমিকম্প, ১৬ আগস্ট ২০০৩ কিন্নর জেলায় এবং ২০১০ সালের আগস্ট রাতে উত্তরাঞ্চলের বৃদ্ধ কেদার, বালগঙ্গা উপত্যকার বিরাট ভূমিধ্বস, ২০১১ ও ২০১২ সালে উত্তর-কাশিতে ভয়াল বন্যা বিপর্যয় হয়। ২০১৩ সালের ১৭ জুনে উত্তরাখণ্ডের বন্যাতে অন্তত ১০ হাজার মানুষ ভেসে গেছিলেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ চামোলি জেলায় ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ও স্মরণীয়। এইভাবে একের পর

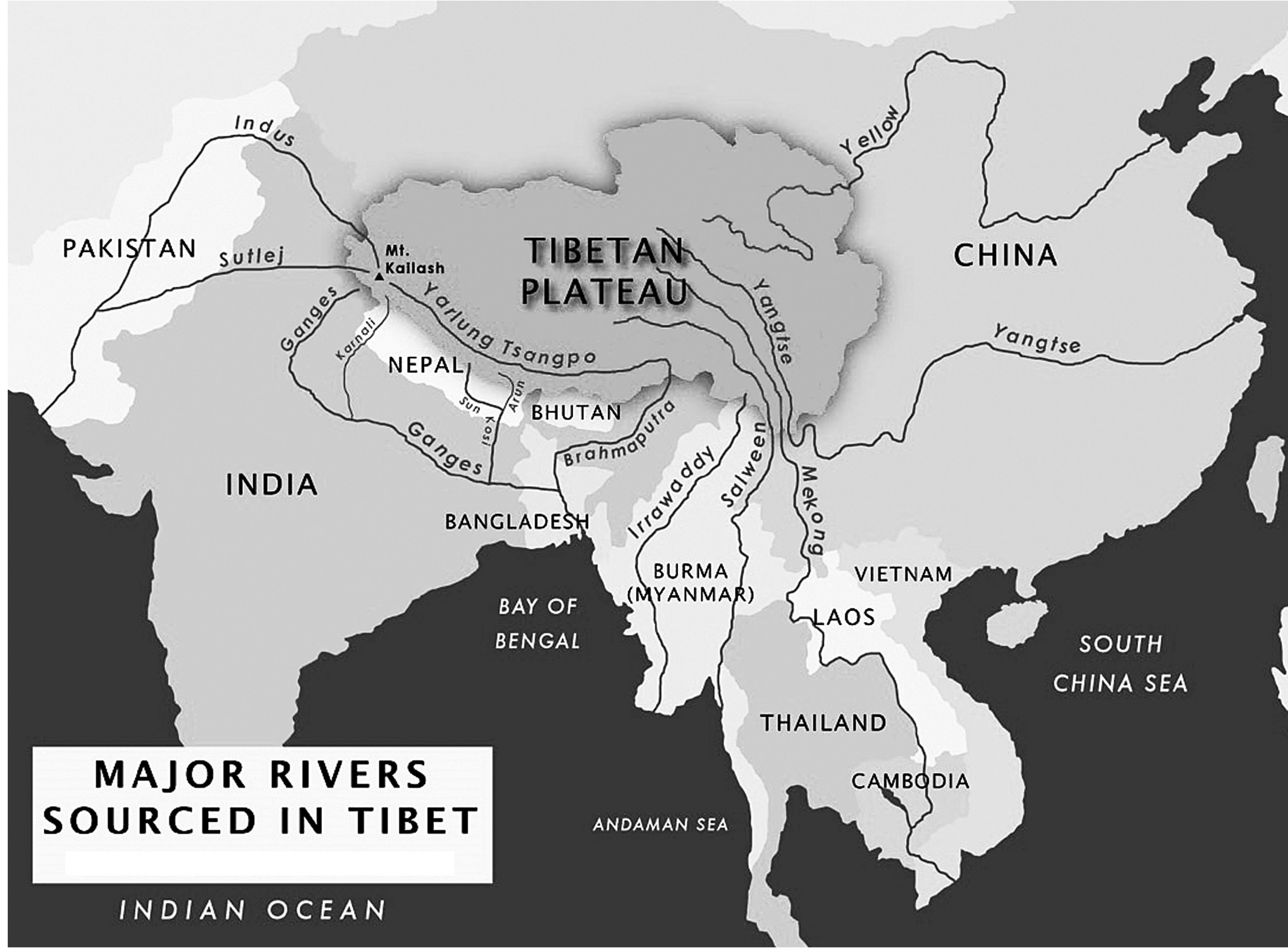

তিব্বত থেকে উৎপন্ন প্রধান নদীগুলি

এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেও আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। প্রকৃতিকে শুধুমাত্র জয় করার নেশায় আমরা এখনো মেতে আছি। আমরা শিখিনি যে প্রকৃতিকে জয় করা যায় না, তার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়।

কেদারনাথের যে অঞ্চলটি মারাত্মক ভূমিকম্প প্রবণ সেখানে গত ১৯৮০ সাল থেকে এলোপাথাড়ি রাস্তা নির্মাণ, বহুতল আবাসন, বাজার হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডের চৌদ্দটি নদীতে দুশোটিরও বেশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ হয়েছে (আরো ১৫০টির মত নির্মাণের ছাড়পত্র মেলার অপেক্ষায়)। প্রায় ৪৫০০০ হেক্টর বনভূমি সাফ করা হয়েছে। এগুলির কোনটি পাহাড়ের নিজস্ব প্রাকৃতিক বাস্তু শৃঙ্খলা সহায়ক নয়। উত্তরকাশী, গৌরীকুণ্ড প্রভৃতি প্রতিটি জায়গাতেই বড় বড় বিপর্যয়ের পর নানা সতর্কবার্তার কথা শোনা গেলেও আজ পর্যন্ত বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। দেবদারু, শাল, সেগুন, খরশু, ভুজ, বার্জ, গুরাস হিমালয়ের মূল বনভূমি বা প্রধান গাছ। এবং এই বড় ও ঘন পাতাওয়ালা গাছেদের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে হিমালয় রক্ষার ক্ষেত্রে। বৃষ্টির ফোঁটা এই বড় পাতাওয়ালা ঘন গাছের কারণে মাটিকে সরাসরি আঘাত করতে পারে না।

দেরাদুনে ঘন আবাসন

বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে এই গাছের ঝরাপাতার ওপর পড়ে এবং সেই জল কখনো বা গাছের শিকড় দিয়ে, আবার কখনো পাহাড়ের ফাটল দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জন্ম দিত অসংখ্য ছোট-বড় ঝরনার, তার সাথে মিশে থাকত হিমবাহ গলা জল, এই সম্মিলিত জলের ধারাগুলি একত্রিত

নদীর বুকে ডাম্পিং জোন

হয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে নেমে এসে জন্ম দিত নদীর। এরপর উপনিবেশিকদের সময় থেকে এ দেশে রেলপথ বিস্তারের সাথে সাথে, রেলের স্লিপার ও বগি নির্মাণে, এইসব গাছেদের নিধনযজ্ঞ ব্যাপকভাবে শুরু হল। এছাড়া বয়লারের জ্বালানির প্রয়োজন ছাড়াও প্রচুর তেল থাকার দরুন চিড়, পাইন বৃক্ষের কদর বাড়তে লাগল। সাহেবরা হিমালয়ের নিজস্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকেই পাল্টে ফেলা শুরু করলেন। ফলে হিমালয়ের নিজস্ব প্রাকৃতিক গাছেদের সরিয়ে খুব সহজভাবেই অতিথি গাছেরা ওই জায়গায় জায়গা করে নিল। সাথে সাথে ভাঙতে লাগল হাজার হাজার বছর ধরে চলা বৃষ্টির সাথে মাটি ও নদীর এক নিবিড় শৃঙ্খল। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা হিমালয়ের কোলে গজিয়ে ওঠা পর্যটনশিল্প, শহর, সরকারি অফিস-আদালত, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, হিমালয়ের নিজের সত্তাকে ধ্বংস করতে লাগল। ভারতীয় হিমালয়ের উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি হল বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর মতন তীর্থস্থানের জন্য সুপরিচিত। এই রাজ্যের জনসংখ্যা ১০ কোটির কাছাকাছি, ২০১১ সালে ২৫০ লক্ষেরও বেশি পর্যটক সেখানে এসেছিলেন। ২০১৩ সালের বন্যা শুধুমাত্র চোরাবালি হিমবাহ নির্গত মন্দাকিনী নদী বা হিমবাহ বিস্ফোরণের কারণে ঘটেনি। বাস্তুহারা ছোট ছোট বা বড় নদীগুলির ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের সবচেয়ে বড় বিপদ চারধাম সড়ক যোজনা।

Char Dham all weather road project যেটি যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ধামের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেছে। এই প্রকল্পটিতে ১০ মি. অবধি একক লেনের রাস্তাগুলি দুটি লেনে প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৮৮৯ কিমি. দীর্ঘ সড়ক পথ তৈরি করতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১১,৭০০ কোটি টাকা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী সড়ক পথের জন্য ১৫টি ফ্লাইওভার, ১০১টি সেতু, ৩৫৯৬টি কালভার্ট, ১২টি বাইপাসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এবং ৩২ কিমি. রেলপথের জন্য বরাদ্দ ৪৩,২৯২ কোটি টাকা। ২৭টি নতুন স্টেশন, ৬১টি টানেল, ৫৯টি ব্রিজ, (মোট টানেলের দৈর্ঘ্য ২৭৯ কিমি.)। কথা ছিল এই স্থানচ্যুত মাটি নিচে নামিয়ে এনে, একেবারে পাথুরে জায়গাকে ভরাট করে সেখানে জঙ্গল তৈরি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। একের পর এক ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড়ের গায়ে ফাটল ধরনো হচ্ছে, যার ভয়াবহ কম্পনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা পাহাড়ের আভ্যন্তরীণ কাঠমো। ফাটল ধরা ওই পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির বা হিমবাহের জল ভিতরে প্রবেশ করে পাথরের বাঁধনকে হালকা করে দিচ্ছে। ফলে ভূমিধ্বস বেড়েছে বহুগুণ। আর বাকি প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ ফেলা হচ্ছে নদীর বুকে। গঙ্গা, অলকানন্দা, নদীর বুকে বানানো হয়েছে বড় বড় ডাম্পিং জোন। কখনো কখনো ওই ধ্বংসস্তূপ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে নিচের দিকে। অথচ হিমালয়ের জন্য বরফগুলি হল জলের আকর, প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ, আর না জানি কত জীব ও উদ্ভিদ এর উপর নির্ভরশীল।

নির্মীয়মান রাস্তাগুলি প্রায়ই হিমবাহ অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়-এর বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন হিমবাহের এত কাছে অবৈজ্ঞানিক কাঠামো নির্মাণের ফলে প্রচুর ধুলোবালি হিমবাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে, ফলে হিমবাহগুলি আর আগের মত সাদা দেখায় না। এই ধূলিকণা হিমবাহের ক্ষেত্রে খুবই বিপদজনক। এর ফলে বরফ আগের মত ৯৭-৯৮% সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করতে পারছে না, তাপ শোষণ করে বরফকে খুব দ্রুত গলিয়ে দিচ্ছে। যদিও ধূলিস্তর ১-২ মিলিমিটারের বেশি হবে না, তবে এটি বরফ গলনের হার

গাছকাটা ও রেলওয়ে স্লিপার ব্যবহার

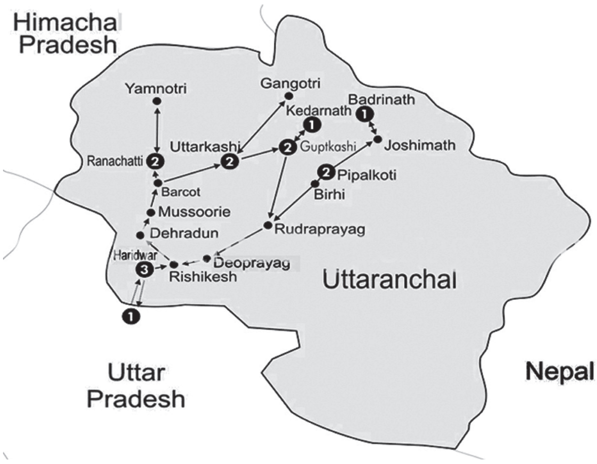

চারধাম সড়ক যোজনার মানচিত্র

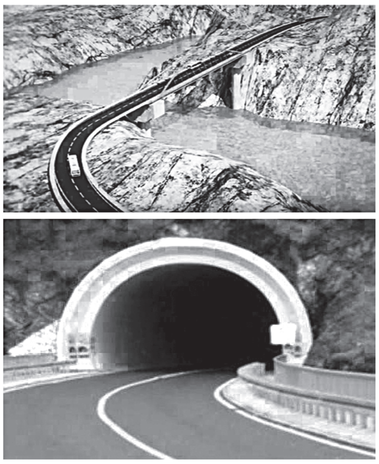

পাহাড় কেটে নদী পেরিয়ে সেই প্রকল্পিত রাস্তা

মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। হিমবাহের এই পরিবর্তন এই অঞ্চলের জলবায়ু ও জীববৈচিত্র্যের উপর ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। নদীগুলি উৎসমুখেই শুকিয়ে যাচ্ছে। The International Centre for Integrated Mountain Development (I.C.I.M.D.)-এর ডেপুটি ডিরেক্টর একলব্য শর্মা এক বিবৃতিতে জানান, আমরা হিসেব করে দেখেছি উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি আর ১.৫° সেলসিয়াস বাড়ে তবে হিন্দুকুশ হিমালয়ে তাপমাত্রা বাড়বে ০.৩° সেলসিয়াস আর উত্তর পশ্চিম হিমালয় এবং কারাকোরাম পর্বতমালার তাপমাত্রা বাড়বে ০.৭° সেলসিয়াস। I.C.I.M.D. একটি রিপোর্টে জানাচ্ছে শুধু হিন্দুকুশ পর্বতমালার হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে ৮৭৯০টি হ্রদ। বরফ গলার মাত্রা এইভাবে বাড়তে থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই অন্তত ২০০টি হ্রদেই ফাটল ধরবে এবং ভয়াল বন্যা দেখা দেবে। এর পরেই গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, সালাউইন, মেকং সহ নদীগুলি তীব্র জল সংকটের মুখে পড়বে, চরিত্র বদলাবে বর্ষা, বর্ষা দীর্ঘায়িত হবে কিন্তু বৃষ্টি হবে সামঞ্জস্যপূর্ণহীন। হড়পা বান-এর পরিমাণ বাড়বে, ফলে জলের স্থায়িত্ব বেশি না হওয়ায় ভূগর্ভে সঞ্চিত জলের পরিমাণ কমবে। এখানেই থেমে নেই আমরা। কয়লা, পেট্রোলিয়াম-এর মতন জীবাশ্ম জ্বালানি বায়ুমণ্ডল দূষণ করে, ফলে বিকল্প শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেল জলবিদ্যুৎ, আর তাতেই প্রভাবিত হল ভারত সরকারের নীতি। বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার দোহাই দিয়ে শুরু হল নদীতে যথেচ্ছ বাঁধ দেওয়া। ভুটান, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে ৪০০টিরও বেশি বড় বাঁধ নির্মাণয়মান। চিন ও তিব্বত সীমান্তে নতুন করে আরো শতাধিক বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডে এখন ৭০টির বেশি হাইড্রলিক প্রজেক্ট নির্মায়মান।

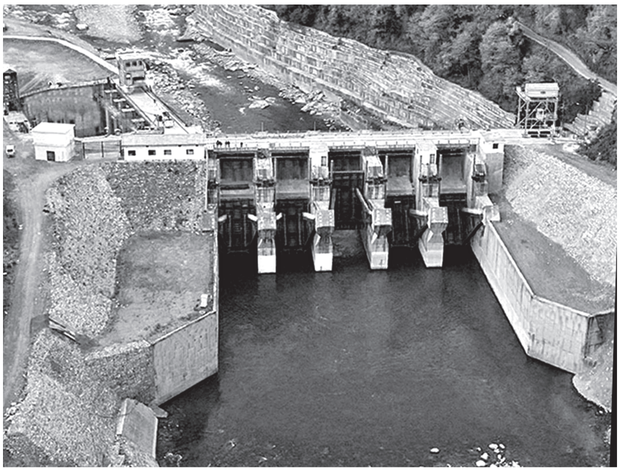

সিংগলি-ভাটওয়া বাঁধ

হড়পা বান

হিমালয়ের নুড়ি বালি হয়ে ফিরে আসবে সমভূমিতে, এটিই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দূষণমুক্ত বিকল্প শক্তি হিসেবে জায়গা করে নিল জলবিদ্যুৎ। আর তাতেই দেশজুড়ে বন্দী করা হল নদীগুলিকে, সেচ ও বিদ্যুতের নাম করে শুরু হল যথেচ্ছভাবে জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ। হিমালয়ের নুড়ি, পলি গিয়ে জমাট হল বাঁধের ওই বিরাট বিরাট জলাধারে। ফলে সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়ল। বহমান নদী পরিণত হল বদ্ধ জলাশয়ে, আর ভাটির দিকে নদী হয়ে পড়ল শীর্ণকায়, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল ভাটির দেশগুলি। গত কয়েক দশক ধরেই এই নীতি নদীর উজানে থাকা দেশগুলোর সাথে ভাটির দেশগুলির সম্পর্ক ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

এইভাবে সাময়িক উন্নতির আশায়, কখনো বা নিজেদের দম্ভ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিমালয়ের অরণ্য ধ্বংস, নদীপথে যথেচ্ছ বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অবৈধ খনন, নগরায়ণ এককথায় হিমালয়কে জয় করার নেশায় আমরা তিলে তিলে তাকে শোষণ করছি। আর তাতেই ভয়ঙ্কর দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে হিমালয় শুধুমাত্র একটি পর্বতমালা নয়, ওখানে লুকিয়ে আছে আমাদের সমাজ ও মানব সভ্যতার জীয়নকাঠি।

লেখক বিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার শিক্ষক, নদী ও পরিবেশ গবেষক ও কর্মী।
email:anuphalderkly@gmail.com • M. 9143264159

মা ন স প্র তি ম দা স

হিমালয়ের অরণ্য : বিপন্নতার ইতিবৃত্ত

গাছ বাঁচাবো গাছ জড়িয়ে : চীপকো আন্দোলন

২০০১ সালের ৪ আগস্টের ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি। বাল্মীকি প্রসাদ সিং লিখছেন পূর্ব হিমালয় নিয়ে। উপসংহারে এসে এক সোনালি বাস্তবের চিত্র আঁকছেন তিনি। বলছেন, সেই সময়ে পার্বত্য দেশ ভুটানের সত্তর শতাংশ ঢাকা অরণ্যে পর্যটনকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। ১৯৯৯ সালে সেদেশে তৈরি হয়েছে এক বিস্তারিত নীতি, নাম দেওয়া হয়েছে 'ভুটান টুয়েন্টি-টুয়েন্টি ঃ আ ভিশন ফর পীস, প্রসপারিটি অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস'। আধুনিকতার ক্ষতিকর দিকগুলো সামলে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তিতে ঘোষিত হয়েছে 'গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস' নামে একটা সূচক। জাতীয় জীবনের সঙ্গে আনন্দকে বাধ্যতামূলকভাবে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা বিশ্বে সেই প্রথম। এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য মিজোরামে তরুণরা প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। সিকিমেও পর্যটনকে খেয়ালখুশি মত বাড়তে না দিয়ে সীমিত করা হয়েছে একটা পথ বা ট্রেল বরাবর। কিন্তু শেষে এসে এই আপাত সুখের সুর প্রবন্ধের গোটা শরীর জুড়ে ধ্বনিত নয়।

পূর্বের পরিণতি

পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য যে ভালো অবস্থায় নেই তার উল্লেখ প্রবন্ধে এসেছে বারে বারে। ভুটানের পাদদেশে মানস ন্যাশনাল পার্কের কথাই ধরা যাক। পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই জাতীয় উদ্যানে অন্ততঃ পাঁচশো ধরনের বৃক্ষ রয়েছে। সেখানে রয়েছে এমন অদ্ভুত ঘাস যা অন্যত্র পাওয়া কঠিন। গত শতকের শেষ

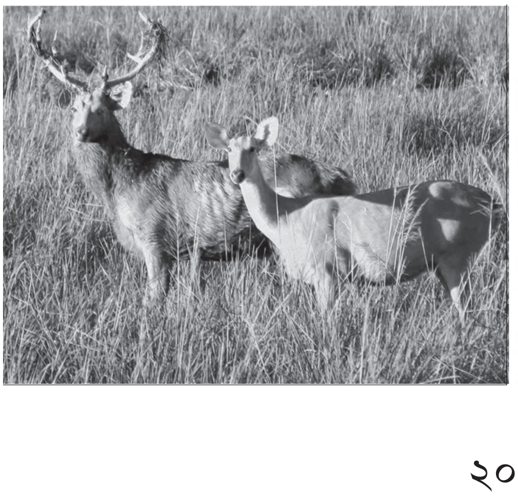

মানসের বিরল ঘাস, পাখি ও মাছ

অবধি এই অরণ্যে শনাক্ত করা হয়েছে চারশো ধরনের পাখি। অরণ্যের গা ঘেঁষে বয়ে চলা মানস নদীতে রয়েছে মাছের বৈচিত্র্য। হাতি, গণ্ডার, বাঘ, বুনো মোষ, গাউর ইত্যাদি জন্তুতে ভরপুর মানস। ১৯৮৪ সালে এই অরণ্যকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু শান্তি রইল না সবুজে আচ্ছাদিত এই ভূখণ্ডে। অসমের বোড়ো এবং আলফা আন্দোলনে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হল এই অরণ্য। রক্ষীরা ভয়ে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, আতঙ্কে দিন কাটাতে লাগল জঙ্গলের বাইরে রেঞ্জ হেডকোয়ার্টার্সে। জনজাতির মানুষদের এই আন্দোলনের উৎস এবং ভিত্তি নিয়ে নিশ্চয়ই অন্যত্র আলোচনা করা যেতে পারে কিন্তু অশান্তির ছায়া যে জঙ্গলকে গ্রাস করেছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র। প্রচুর কাঠ যেমন পাচার হয়েছে এই সময় তেমনি ইচ্ছেমত শিকার করা হয়েছে পশু ও পাখি। ফলে আন্দোলনের শেষে যখন আইনের শাসন ফিরল অরণ্যে তখন দেখা গেল যে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়েছে মানস ন্যাশনাল পার্ক।

একইভাবে লেখক উল্লেখ করেছেন কাছাকাছি সময়ে অরুণাচল প্রদেশে লোভের রাজনীতির কথা। নানারকম বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন বেশ কিছু কাঠ চেরাই কারখানাকে অনুমতি দিল জঙ্গল থেকে দেদার কাঠ সংগ্রহ করতে। কর্মসংস্থানের যুক্তি দেখিয়ে চলছিল এই গাছ পাচার। ঠিক সেই সময় হস্তক্ষেপ করল দেশের শীর্ষ আদালত। ১৯৯৮ সালের ১৫ জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক আদেশে অরুণাচল

দেবাং

প্রদেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হল জঙ্গলের গাছ কাটা। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রককে তৈরি করতে হয়েছিল এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। তারা অনুসন্ধান করে দেখল যে অরুণাচলের দেবাং উপত্যকায় বৃষ্টিস্নাত চিরসবুজ অরণ্য প্রায় শেষ। কমিটি দোষ দিল স্বশাসিত পরিষদগুলোকে। এদের দখলে থাকা অরণ্যের চেকপোস্টে প্রহরী নিয়োগ হত অদ্ভুত এক নীলামের পদ্ধতিতে। যে সংস্থা সব থেকে বেশি টাকা দিতে রাজি হত তারাই পেত চেকপোস্ট প্রহরার অধিকার। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এই অর্থ তারা উসুল করবে গাছ কেটে তার কাঠ বিক্রি করে। অন্যদিকে দেখা গেল যে রাজ্যের অরণ্য থেকে কাটা গাছের মাত্র এক শতাংশ ব্যবহার করে স্থানীয় মানুষ। বাকিটা ট্রাক বোঝাই হয়ে পাচার হয়ে যায় দূরদুরান্তে। অতি সামান্য মূল্যে এক-একটা গোটা পাহাড়ের জঙ্গল চলে যায় ব্যবসায়ীদের দখলে। ভাগ পান স্থানীয় এবং রাজ্যের নেতারা।

ট্রাক বোঝাই কাঠপাচার

ফলে আদালতের আদেশ শুনে তাঁরা খুশি হতে পারেন না। রাজ্যের কোষাগারে অর্থের ঘাটতি থেকে শুরু করে কাজ-হারানো তরুণদের উগ্রপন্থী হয়ে ওঠার ভয় দেখাতে থাকেন তাঁরা। এদিকে স্থানীয় গরিব মানুষ অতি সামান্য মজুরিতে কাজ করে চলে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করতে। বাল্মীকি প্রসাদ সিং এটা ঠিকই লিখেছিলেন যে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো উত্তর-পূর্বের রাজনৈতিক নেতাদের বিক্ষোভের সঙ্গে অন্ততঃ সেই মুহূর্তে গলা মেলাননি। তার ফলে ফাঁকি দিয়ে কাঠ পাচার চলতে থাকলেও সরাসরি আদালতের রায় লঙ্ঘনের ঘোষণা করতে সাহস পাননি উত্তর-পূর্বের রাজনীতিকরা।

প্রবন্ধ-পাঠকের চিরকালীন আগ্রহ পরিসংখ্যানে। তাই পূর্ব হিমালয় নিয়ে আলোচনা চলতে-চলতে মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ দেওয়া যেতেই পারে। ২০০১ সালে ভুটান সহ পূর্ব হিমালয়ের সব রাজ্যের পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে মোট অরণ্যের আচ্ছাদন ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার দুশো উনচল্লিশ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ভূমির ৬১.৯ শতাংশ। এর মধ্যে সিংহভাগ ছিল পাহাড়ে (১,৩৯,২৫৭ বর্গ কিলোমিটার)। সেখানে অরণ্যের আচ্ছাদন ছিল ৭৮.৯ শতাংশ। পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের পার্বতীয় অঞ্চলের অরণ্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে 'পুণ্য বনাঞ্চল' (sacred groves) বাদ দেওয়া যায় না। এ নিয়ে নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটির বি. কে. তিওয়ারি এবং বি. খরকোঙর ২০১৬ সালের নভেম্বরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কারেন্ট রিসার্চে। মেঘালয় নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা, ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, রাজ্যে পুণ্য বনাঞ্চলের সংখ্যা একশো তিন। পূর্ব খাসি পাহাড়ে এগুলোর সন্ধান মেলে বেশি পরিমাণে। এছাড়াও পশ্চিম খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়ে উপস্থিতি আছে পুণ্য বনাঞ্চলের। এখানে সরকারের হস্তক্ষেপ চলে না। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, স্থানীয় গ্রামীণ প্রশাসনের হাতে থাকে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নানা কারণে এগুলোর ক্ষয় ঘটছে ভীষণভাবে। এর মধ্যে অন্যতম একটা কারণ, নিঃসন্দেহে বিতর্কিত, হল ধর্মান্তর। বহুকাল ধরে চলে আসা খাসি ধর্মের অনুশীলন ত্যাগ করে যখন এলাকার মানুষ খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করল তখন ভাঙন ধরল বিশ্বাসের ভিতে। নিজেরাই নিজেদের অসংস্কৃত এবং আদিম বলে আখ্যা দিল ধর্মান্তরিতরা। অমিল

হল বনাঞ্চলের পুজো করার জন্য দরকারি পুরোহিত। ফলে আর 'পুণ্য' রইল না বনাঞ্চল। উবে গেল 'দেবতা'র অভিশাপের ভয়, দূর হল আবশ্যিক আচরণের, নিষেধ মানার (taboo) বাধ্যবাধকতা। আগে যারা জঙ্গল থেকে কেবল ভেঙে পড়া ডাল ইত্যাদি সংগহ করত তারাই এবার গোটা গাছ কাটতে শুরু করল। শহুরে আদবকায়দার প্রতি টান যত বাড়ল ততই বাড়ল এই অভ্যাস, যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী গাছ কেটে বিক্রি করতে শুরু করল। একটা জায়গায় তো রীতিমত অরণ্যের মধ্যেই কাঠ-চেরাই কারখানার সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা, কাছেই রয়েছে চা-জলখাবারের দোকান। নিয়মিতভাবে কাঠ কেটে নিজেদের বাড়িঘর তৈরি করছেন অঞ্চলবাসীরা। বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন কাজে পুণ্য বনাঞ্চলের কাঠের ব্যবহারে উৎসাহ আছে, বাধা আর নেই। পশ্চিম খাসি পাহাড়ে গবাদি পশু চারণের ফলেও ক্ষতি হয়েছে অরণ্যের। আর একটা কারণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গবেষকরা যা নিঃসন্দেহে উদ্ভিদবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, বাইরে থেকে কিছু বিচিত্র প্রজাতির আগাছা এবং বৃক্ষের আগমন ঘটেছে এই সব বনাঞ্চলে। এগুলো নিজেরা টিঁকে থাকছে বেশ ভালোভাবে আর ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে এই সব বনাঞ্চলের আদি বৃক্ষের দলকে।

পশ্চিমে নেই পার্থক্য

অরণ্যকে সংরক্ষণ করা আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নয়, হিমালয়ের সবুজ আচ্ছাদনই বা বাদ যায় কেন? পশ্চিম হিমালয়ের কথা বলতে গেলে এই সংস্থার বৃত্তান্তে খুব একটা পার্থক্য ধরা পড়বে না। তবে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে (এবং পরবর্তীতে উত্তরাখণ্ড) অরণ্য ছেদন এবং বাঁধ নির্মাণ নিয়ে আন্দোলনের ফলে অনেক বেশি প্রচারের আলোয় এসেছে পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্যের অবস্থা। চিপকো এবং তেহরি শুধু দেশে নয়, গোটা বিশ্বের কাছে পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক হয়ে গিয়েছে। শেখর পাঠকের লেখা 'দ্য চিপকো মুভমেন্ট ঃ আ পিপলস হিস্ট্রি' উত্তরাখণ্ডের অরণ্য, মানুষ, বনাঞ্চল ও সামাজিক আন্দোলন বোঝার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বই। ২০০০ সালে তৈরি হওয়া নতুন রাজ্য উত্তরাখণ্ডে বনাঞ্চলের পরিসংখ্যান পাচ্ছি ২০২১ সালে প্রকাশিত শেখর পাঠকের বইতে। রাজ্যের চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে অরণ্য রয়েছে, সেটা মোট জমির ৬৪.৭৯ শতাংশে। লেখকের মতে এর মধ্যে অর্ধেকেরও কম প্রকৃত ঘন জঙ্গল। এখানে রয়েছে ছটা জাতীয় উদ্যান। ৫২১ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে ১৯৩৬ সালে তৈরি হয় হেইলি পার্ক, পরে সেটারই নামকরণ হল জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক। নন্দাদেবী ন্যাশনাল পার্ক ও ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। রাজাজি ন্যাশনাল পার্কের প্রতিষ্ঠা এর পরের বছর। অন্যান্য জাতীয় উদ্যানের থেকে তুলনায় অনেক বড়, ২৩৯০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা গঙ্গোত্রী ন্যাশনাল পার্ক তৈরি হয় ১৯৮৯ সালে, ১৯৯৯-তে রূপ পায় গোবিন্দ পশু বিহার ন্যাশনাল পার্ক। অর্থাৎ প্রত্যেকটা জাতীয় উদ্যান তৈরি হয়েছে উত্তরাখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে। বন্যপ্রাণের বৈচিত্র্য বোঝাতে একটা উদাহরণই বোধহয় যথেষ্ট। সালিম আলি যে ২৮৭টা ভারতীয় পাখির প্রজাতি বর্ণনা করে গিয়েছেন তার মধ্যে ২৩০টা পাওয়া যায় এই রাজ্যে। অরণ্যের সম্পদ এখানে অঢেল কিন্তু সেটা রক্ষা করার থেকে লুন্ঠন করাতেই আগ্রহ দেখিয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের বণিকরা।

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি ৩০ মে দিনটাকে শহীদ দিবস হিসাবে পালন করে উত্তরাখণ্ডে। ১৯৩০ সালে রাওয়া (Rawain) অঞ্চলে মানুষ মারার যে ঘটনা ঘটেছিল তার স্মরণে। কী হয়েছিল সেখানে যা এই প্রবন্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? পিছিয়ে যেতে হবে অনেকটা সময়। ব্রিটিশ আমলে শোষণ, অত্যাচার শুধু যে সাদা চামড়ার সাহেবরা করত তাই নয়। দেশীয় রাজারা এবং তাদের নিয়োজিত আধিকারিকরা এই শোষণকে পৌঁছে দিত অসহনীয় পর্যায়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম সমর্থক ছিলেন সুদর্শন শাহ। তাঁর পিতা প্রদ্যুম্ন শাহ ছিলেন অবিভক্ত গাড়োয়ালের রাজা। গোর্খাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মারা পড়লেন তিনি, সেটা ১৮০৪ সাল। পরে যখন গোর্খাদের পরাজিত করা গেল তখন কোম্পানি সুদর্শনকে রাজ্যপাটের একটা অংশ ফিরিয়ে দিল। এই অঞ্চল পরিচিত হল তেহরি গাড়োয়াল হিসাবে। কোম্পানির আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েই শাসন করতে লাগলেন সুদর্শন। প্রজাদের উপর উচ্চহারে কর চাপালেন তিনি। সেটা আদায় করার নামে কর্মচারীরা কম শোষণ করেনি। এ নিয়ে রাজার কাছে নিয়মিত অভিযোগ পেশ করত প্রজারা। অভিযোগ জানানোর সময় উঁচু পাহাড়ে রাজার বাসভবনে নিজেদের গোটা পরিবার, গরু-বলদ নিয়ে উপস্থিত হত তারা। এই ধরনের সভাকে বলা হত 'ধন্দক'। দেখা যেত রাজার হস্তক্ষেপের পর কিছুদিন ঠিকঠাক চলত সব কিছু কিন্তু তার পরে আবার ফিরে আসত সেই অত্যাচার। ব্রিটিশ প্রশাসন রাজ্যের অরণ্যের দখল নিয়ে নেওয়ার পরে বেড়ে গেল সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ। ১৮৮৭ সালে রামোলির বাসিন্দারা ঘাস আর কাঠের উপর বসানো কর প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানাতে লাগল। একইসঙ্গে দাবি উঠল বেগার শ্রমের অত্যাচার বন্ধ করার। যে অরণ্যে এতদিন নির্বিঘ্নে কাঠকুটো, ঘাস সংগ্রহ করেছে গ্রামবাসীরা সেখানকার রাজা যদি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন তাহলে চলবে কী করে! এমন আন্দোলন ছড়াতে লাগল আশেপাশের এলাকাতেও। কখনও গ্রামবাসীরা হিংস্র হলে রাজাকে ময়দানে নেমে শান্ত করতে হত তাদের। এদিকে রাজা অরণ্যের কাঠ নিয়েও ব্যবসা করেন, ব্রিটিশের সঙ্গেই করেন। ফলে বেড়া দিয়ে জঙ্গল ঘিরে সেটাকে 'সংরক্ষিত' আখ্যা দিতে হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা জীবনযাপনের যাবতীয় রসদ সংগ্রহ করত অরণ্য থেকে, সংরক্ষিত হয়ে গেলে তাদের সে অধিকার গেল লোপাট হয়ে। তাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল তারা। একদিন দুশো গ্রামবাসী লাঠিসোটা নিয়ে উপস্থিত হল জঙ্গল রক্ষার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের তাঁবুর কাছে। কনজার্ভেটরকে পেটাল তারা, বন্দুক দিল ভেঙে। বাকিদের অবস্থাও খুব ভালো হল না। এইভাবে চলল দেশী ও বিদেশী প্রশাসকদের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের বিক্ষিপ্ত আক্রমণ। এল ১৯৩০। সিংহাসনে তখন নরেন্দ্র শাহ। ১১ মে তিনি স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে গেলেন ইংল্যান্ডে। ব্রিটিশ প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর সেই সময়ে একটা সমাধানে আসতে চাইলেন অশান্ত গ্রামবাসীদের সঙ্গে। কিন্তু গ্রামবাসীরা রাজার

সঙ্গে ধন্দক সভা চাইছে। তারা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে রাজাকে ফেরত আসতে বলল। সেই ধন্দকে যেন সব গ্রামবাসী উপস্থিত থাকে সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ জারি হল। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়াতে বেশ কিছু ধরপাকড় করল রাজ্যের উজির। যুদ্ধক্ষেত্রে এবার উদয় হলেন দেওয়ান চক্রধর জুয়াল। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে রাওয়া অঞ্চলে উপস্থিত হলেন তিনি। ৩০ মে জমায়েতকে ঘিরে ধরে গুলি চালানো হল কৃষকদের উপর। প্রায় একশো কৃষক মারা পড়ল গুলিতে। এই ঘটনাকে তেহরি গাড়োয়ালের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ড' বলে বর্ণনা করা হয়। অরণ্যের উপর নিজেদের যুগলালিত অধিকার ফিরে পেতে এই যে লড়াই ও আত্মবলিদান, একেই সম্মান জানানো হয় শহীদ দিবসে।

অন্যদিক থেকেও দেখা সম্ভব অরণ্যের লুণ্ঠন ও স্থানীয় মানুষের বঞ্চনাকে। যোড়শ শতক নাগাদ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ অরণ্যই সাফ হয়ে গিয়েছিল। নিজেদের দেশের শিল্পকে চাঙ্গা রাখতে কোনও দেশের অরণ্যকে ছাড় দেয়নি ব্রিটেন। এদিকে ইংল্যান্ডে ওক গাছের ভাণ্ডারও শেষ কিন্তু কাঠের সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে রয়্যাল নেভিকে রক্ষা করতে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে ব্রিটেনের সবথেকে বড় ঢাল হল সেই নৌবাহিনী। এই সময় কাজে এল ভারত থেকে সরবরাহ হওয়া সেগুন কাঠের সম্ভার। বলা হয়, নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিটেনকে রক্ষা করেছিল ভারতের অরণ্য। গোয়া ও মালাবার উপকূলে নির্মিত হত কাঠের জাহাজ। ইংল্যান্ডে কাঠ নিয়ে গিয়েও করা হত নির্মাণের কাজ। এদিকে রেলপথ নির্মাণের কাজেও ভারতের অরণ্যের নির্বিচার বিনাশ ঘটিয়েছিল ব্রিটিশরা। গাড়োয়াল এবং কুমায়ুন হিমালয়ের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক বলে সেই এলাকার উল্লেখ করা দরকার। রেলের স্লিপার বানাতে দুটো এলাকাকে প্রায় বৃক্ষশূন্য করে ফেলেছিল ব্রিটিশের বরাত পাওয়া দেশী ও বিদেশী কনট্রাক্টররা। এত বেশি গাছ কাটা হত যে সেগুলো সরিয়ে কাজে লাগাতেও পারত না ব্যবসায়ীরা। কাটার পর সেখানেই ফেলে রেখে চলে যেত তারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনওরকম তদারকির ব্যাপার ছিল না। রানিগঞ্জের কয়লা খনি পুরোপুরি চালু হওয়ার আগে রেল নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত লোকজন স্থানীয় অঞ্চলের অরণ্য থেকে গাছ কাটত জ্বালানির জন্য। সেখানেও কোনও বাছবিচার ছিল না। সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের টনক নড়ল। কাঠ তাদের দরকার, গাছ কাটায় কোনো আপত্তি নেই তাদের কিন্তু বেসরকারি কনট্রাক্টররা যেভাবে শেষ করে দিচ্ছে জঙ্গলের পর জঙ্গল তা সাম্রাজ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। অতএব নিয়ন্ত্রণ দরকার, ১৮৬২ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল এই লক্ষ্যে একটা দপ্তর প্রতিষ্ঠার কথা বললেন।

রেল দপ্তরের দরকার ছিল শাল, সেগুন ও দেওদার (দেবদারু) গাছের কাঠ। তাদের কাজের জন্য এগুলোই ঠিকঠাক, শক্তপোক্ত। ১৮৬৪ সালে তৈরি হল ইম্পিরিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। এর পরের সময়টায় শতদ্রু নদীর অববাহিকায় থাকা দেবদারু কাঠ নিঃশেষ হল। শুধু যমুনা নদীর অববাহিকায় ছেড়ে রাখা হল কিছু অরণ্য। ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে দেবদারু কাঠের সাড়ে ছ লক্ষ স্লিপার সরবরাহ হল। এর মধ্যে আবার আইনও তৈরি করল ব্রিটিশ প্রশাসন। প্রথম ফরেস্ট অ্যাক্ট এল ১৮৬৫ সালে এবং তার পরে ১৮৭৮ সালে সেই আইনের আরও কড়া সংস্করণ তৈরি হল। এর মাধ্যমে নিজের ইচ্ছেমত অরণ্যভূমি রেল দপ্তরের ব্যবহারের জন্য সরকার চিহ্নিত করবে বলে জানানো হল। বাকিটা নিয়ে কী করা হবে তার জন্য সময়ে-সময়ে আইন বদলানো হবে। এই অঞ্চলে গ্রামবাসীরা থাকতে পারবেন, ঘুরতে পারবেন কিন্তু সেটা ব্রিটিশ প্রভুদের ইচ্ছাধীন। নিজেদের অধিকার হরণের এই আদেশকে ভালোভাবে নেয়নি অরণ্যচারী মানুষরা যাদের পরিচয় গবেষণাপত্রে দেওয়া হয় 'ট্রাইবাল' হিসাবে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শক্তিতে নগণ্য হলেও বারবার বিদ্রোহ করেছে তারা এবং পরাজিত হয়েছে। যেখানে বিদ্রোহ সরাসরি হয়নি সেখানেও অসন্তোষ ছিল মানুষের মনে। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধীজি যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন তার সঙ্গে সমাপতিত হয় অরণ্যচারীদের অধিকার ফিরে পাওয়ার আন্দোলন। এর ফলে সরকার বেশ কিছু অরণ্য অসংরক্ষিত ঘোষণা করলেও মূল আইনের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে দুটো বিশ্বযুদ্ধেও ভারতের অরণ্য সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছে ব্রিটিশ সরকার। সেখানেও বঞ্চিত হয়েছে অরণ্যচারী মানুষজন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৫২ সালে যে অরণ্য নীতি ঘোষিত হয় তাতে অরণ্যকে 'জাতীয় সম্পদ' বলে উল্লেখ করা হয়, খাটো করা হয় স্থানীয় মানুষের অধিকারকে। ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ আইনের আদলেই যে সেটা তৈরি হয়েছে তা ব্যক্ত করা হয় কোনওরকম সংশয় না রেখে। আইনের অনুচ্ছেদগুলো ঘাঁটলে খুঁজে পাওয়া যাবে এমন পঙক্তি যেখানে সংলগ্ন গ্রামের অস্তিত্বের প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে রেখে তুলে ধরা হয়েছে 'জাতীয় স্বার্থ'কে। অরণ্যকে ব্যবহার করে নানা সম্পদ তথা রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দেওয়া হয় এবং সেটা কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা আলোচিত হয়নি। (Ramachandra Guha, Forestry in British and Post-British India : A Historical Analysis, Economic and Political Weekly, Oct. 29, 1983).

চিপকো আন্দোলনকে দেখতে হবে এই প্রেক্ষাপটে। অরণ্যের স্বাস্থ্য এবং তার 'সংরক্ষণের' আগ্রহকেও স্থাপন করতে হবে এই জায়গায়। কাদের জন্য অরণ্য, কীসের জন্য অরণ্যের সম্পদ? এই প্রশ্নের উত্তর বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকরা। অনেকে তো স্থানীয় মানুষের দাবিকে বিদ্রূপও করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে একাধিক কারণ এসে জটিল করে তুলেছে অরণ্য বাঁচানোর প্রশ্নকে। কিন্তু একেবারে ভিত্তিতে গেলে দেখা যাবে যে মূল সমস্যা জীবনযাপনের বাহারি নকশায় এবং বাণিজ্যের তীব্র আগ্রহে। ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলে অরণ্যের সম্পদকে নিঃশেষ করে দেওয়া আজ এক প্রতিষ্ঠিত রুটিন। এই দৃঢ় শেকল না ভাঙলে অরণ্যের বিলুপ্ত হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

লেখক আকাশবাণীর অনুষ্ঠান প্রযোজক ও বিজ্ঞান লেখক।
e-mail: setmanas2020@gmail.com • M. 9830312654

গার্গী নাগ মজুমদার

হিমালয়ের বুকে ইতিহাসের চলাফেরা

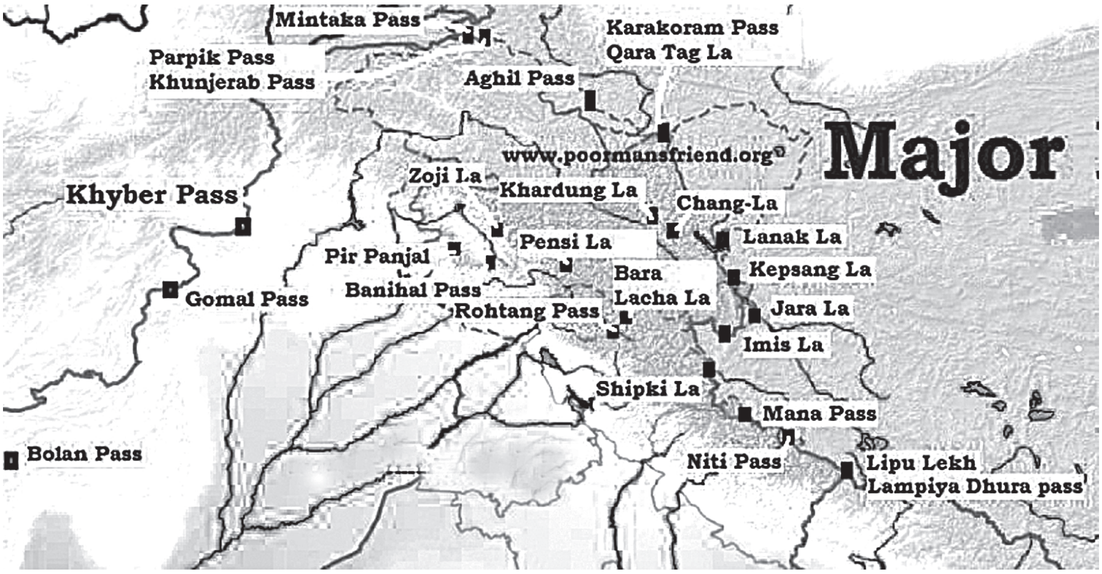

বোলান পাশ   উপরে : প্রধান গিরিপথগুলি   খাইবার পাশ

প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছিলেন

"আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী"

চিরতুষারাবৃত গিরিরাজ হিমালয় পর্বতমালা যেন সত্যিই উত্তরে আমাদের ভারতবর্ষের সদাজাগ্রত প্রহরী হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর জন্যই মধ্য-এশিয়ায় বারোমাস বয়ে চলা শুকনো, কনকনে ঠান্ডা হিমেল বাতাস ভারতকে শীতের চাদরে মুড়ে জবুথবু করতে পারে না। আবার অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুমীবায়ু এসে হিমালয়ের বুকেই ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টিধারা রূপে ঝরে পড়ে। তারই প্রসাদগুণে ভারতভূমি এত সুজলা সুফলা। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলেই উত্তর ভারতের বেশিরভাগ নদীর উৎপত্তি হয়েছে। তাই হিমালয় পর্বতমালা শুধু আমাদের প্রাকৃতিক প্রহরীই নন, বরং গোটা ভারতবর্ষকেই হিমালয়ের দান বলে মনে করা হয়।

তবে উত্তরের এই হিমালয় পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম অংশে রয়ে গিয়েছে এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ—যেগুলির রহস্যময় হাতছানি এড়াতে পারেননি অনেক বিদেশী অভিযানকারী। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই বিভিন্ন বহিরাগত শক্তির আগমন ঘটেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চিরতুষারাবৃত, দুর্গম এই বিপদসঙ্কুল সীমান্ত অতিক্রম করে।

উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমাল ও তোচি গিরিপথগুলি দিয়ে বিভিন্ন যুগে বৈদেশিক জাতিগুলি ভারতে প্রবেশ করেছিল। এগুলির মধ্যে বিদেশীদের পক্ষে ভারতে অনুপ্রবেশের সবথেকে প্রশস্ত প্রবেশপথ হল খাইবার পাসটি। এই গিরিপথটি দিয়ে পেশোয়ার, লাহোর হয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার সমভূমির ভিতর দিয়ে একেবারে দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছান সম্ভব হয়। ভারতের সঙ্গে আফগানিস্থানের সংযোগ স্থাপন হয়ে থাকে গোমাল ও তোচি গিরিপথের মাধ্যমে। কান্দাহারের সঙ্গে ভারতের সংযোগের মাধ্যম হল বোলান গিরিপথটি। আর্যরা মধ্য-এশিয়ার ভিতর দিয়ে যখন প্রথম ভারতে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা এই পথ দিয়েই এসেছিল।

ঋগবেদ (রচনাকাল ১৪০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের ভারতে আগমন সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক এ.এল. ব্যাসাম তাঁর 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া' (The Wonder that was India)-য় এই মত পোষণ করেছেন যে, খ্রি: পূ: ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিমে পোল্যান্ড থেকে পূর্বে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল তৃণভূমি অঞ্চলে যে অর্ধ-যাযাবর গোষ্ঠী বাস করত, তাদেরই একটি শাখার উত্তরপুরুষ হলেন ভারতে আগত আর্যরা। ঐতিহাসিক ব্যাসাম, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আরও বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে বিভিন্ন কারণে আর্যরা তাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করে মধ্য-এশিয়ায় এসেছিল। বৈদিক আর্যরা ভারতে আসার আগে সুদীর্ঘকাল পারস্যে বসবাস করেছিল। এদের একটি শাখা, ভারতীয় আর্যরা গিরিপথের

আলেকজান্ডার

যুদ্ধক্ষেত্রে আলেকজান্ডার

মধ্য দিয়ে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে, দক্ষিণ আফগানিস্থানের কাবুল অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম ভারত (এশিয়া) সীমান্তে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। ঋগবেদে যেমন সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ রয়েছে, তেমনি উল্লেখ রয়েছে 'হিমাবত' বা হিমালয় পর্বতের নামও। পরবর্তীকালে আর্যরা ধীরে ধীরে পূর্ব-ভারতের দিকেও তাদের বসতি স্থাপন করেছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষদিকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পুনরায় উত্তরপ্রদেশের এই অঞ্চল দিয়েই আর এক বৈদেশিক শক্তির আগমন ঘটেছিল ভারতে। এঁরা হলেন ইরানের আর্কেমেনীয় রাজবংশ এই পারসিক রাজারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করেছিলেন, এরপর শুরু হল গ্রিক শাসনের পর্ব।

খ্রি: পূ: ৩২৭ অব্দে যখন গ্রিকবীর আলেকজান্ডার ভারত অভিযান করেন, তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক শাসন কার্যতঃ প্রায় লোপ পেয়েছিল। আলেকজান্ডার, পারসিক সম্রাট দরায়ুসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আরবেলার যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেন। এর সাথে সাথেই তিনি ভারত জয়ের লক্ষ্যে এবং এদেশে তাঁর শাসন কায়েমের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ৩২৭ খ্রি: পূ: হিন্দুকুশ পর্বতের বরফ বসন্তের সোনালি রৌদ্রের উষ্ণতায় গলতে শুরু করলে আলেকজান্ডার তাঁর বাহিনী নিয়ে হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখেন। অম্ভির মত রাজাদের বশংবদ মনোভাব তাঁর জয়ের পথকে সুগম করেছিল। পুরুরাজের কাছে বাধা পেলেও পুরুর বীরত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আলেকজান্ডার হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করার পর এদেশে ছিলেন

মুঘল সৈন্য

মাত্র ২ বছর ৫ মাস (৩২৭ খ্রি: পূ: মে—৩২৫ খ্রি: পূ: সেপ্টেম্বর)।

আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী সময়কাল মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়কাল প্রাচীন ভারত ইতিহাসের যে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অধ্যায় তা আমাদের দেখিয়েছেন গবেষক রোমিলা থাপার। কিন্তু মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষদিক থেকেও (শালিশুকের রাজত্বকাল থেকে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে এক-এক করে পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক জাতিগুলির আগমন হয়েছিল তারা হল ব্যাকট্রিয় গ্রিক বা ইন্দো-গ্রিক, শক, পহ্লব, কুষাণ। এরা ভারতে প্রবেশ করেছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলি অতিক্রম করে। এরা ভারতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সবথেকে বড় কথা এই যে পরবর্তী সময়কালে এরা সবাই ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যযুগেও (১২০৬-১৭০৭) ভারতে যে বৈদেশিক অভিযান হয়েছিল আরব ও তুর্কীদের, তারও প্রবেশপথ ছিল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম ঘেঁষা গিরিপথগুলি। আফগানিস্থানের হিন্দুশাহী রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল পাঞ্জাবের চেনাব নদী থেকে হিন্দুকুশ পর্যন্ত। পশ্চিমদিক থেকে আরব ও তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুশাহী রাজ্য বহুকাল প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু একটানা মুসলিম আক্রমণকারীদের চাপে পড়ে শাহী রাজগণ খাইবার পাসের পূর্বে উদভান্ডপুরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখানকার রাজা জয়পাল ছিলেন গজনীর তুর্কী শাসক সবুক্তিগীন ও তাঁর পুত্র সুলতান মামুদের সমকালীন। কথিত আছে সুলতান মামুদ প্রায় ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। অপর তুর্কী আক্রমণকারী ছিলেন সুলতান মহম্মদ ঘুরী। তাঁরই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী কুতুবউদ্দীন আইবক ছিলেন দিল্লি সুলতানীর প্রথম শাসক। মধ্যযুগের প্রথম ভাগের তুর্কী সুলতানী শাসনের অবসান ঘটেছিল মধ্য-এশিয়া থেকে আগত অপর ভাগ্যান্বেষী বীর মুঘল বিজেতা বাবরের হাতে ১৫২৬-এ পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। শুরু হয়েছিল দীর্ঘ মুঘল শাসনকালের পর্ব (১৫২৬-১৭৫৭) অর্থাৎ হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিশ্রেণির পথ বেয়ে এদেশে এক-এক করে আর্য, পারসিক, ম্যাসিডোনীয়, ব্যাকট্রিয়, শক, কুষাণ, হুন, তুর্কী, মোঘলরা এদেশে এসেছিল বিভিন্ন সময়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে গিয়েছিলেন নিজেদের দেশে। কিন্তু অনেকেই আবার এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এখানকার জনগোষ্ঠীর সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিলেন এদেশেই। এভাবে গড়ে উঠেছিল কুষাণ সাম্রাজ্য, দিল্লির তুর্কী সুলতানদের সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য। যুগে যুগে হিমালয় পর্বতমালা ভারতকে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সুরক্ষায় সযত্নে আগলে রেখেছিল অন্যদিকে হিমালয়ের গিরিপথগুলি মধ্য-এশিয়ার সাথে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক যোগসূত্র রচনা করে চলেছে আজও।

কবি নজরুল ইসলাম লিখেছেন

“মৌনী স্তব্ধ সে-হিমালয়
তেমনি অটল মহিমাময়...।”

হিমালয় পর্বতমালা কার্যতই, সেই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিককাল থেকেই ভারতের বুকে দেশী-বিদেশী শক্তির পালাবদলের ইতিহাসের নীরব শরিক হয়ে, আজও, একইভাবে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গগনচুম্বী মৌনস্তব্ধতা যেন সেইসব বর্ষপুরাতন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে আজও।

লেখক সিটি কলেজ, কলকাতার অধ্যাপিকা।

e-mail: gargi.nag.majumdar@gmail.com ● M. 9433866811

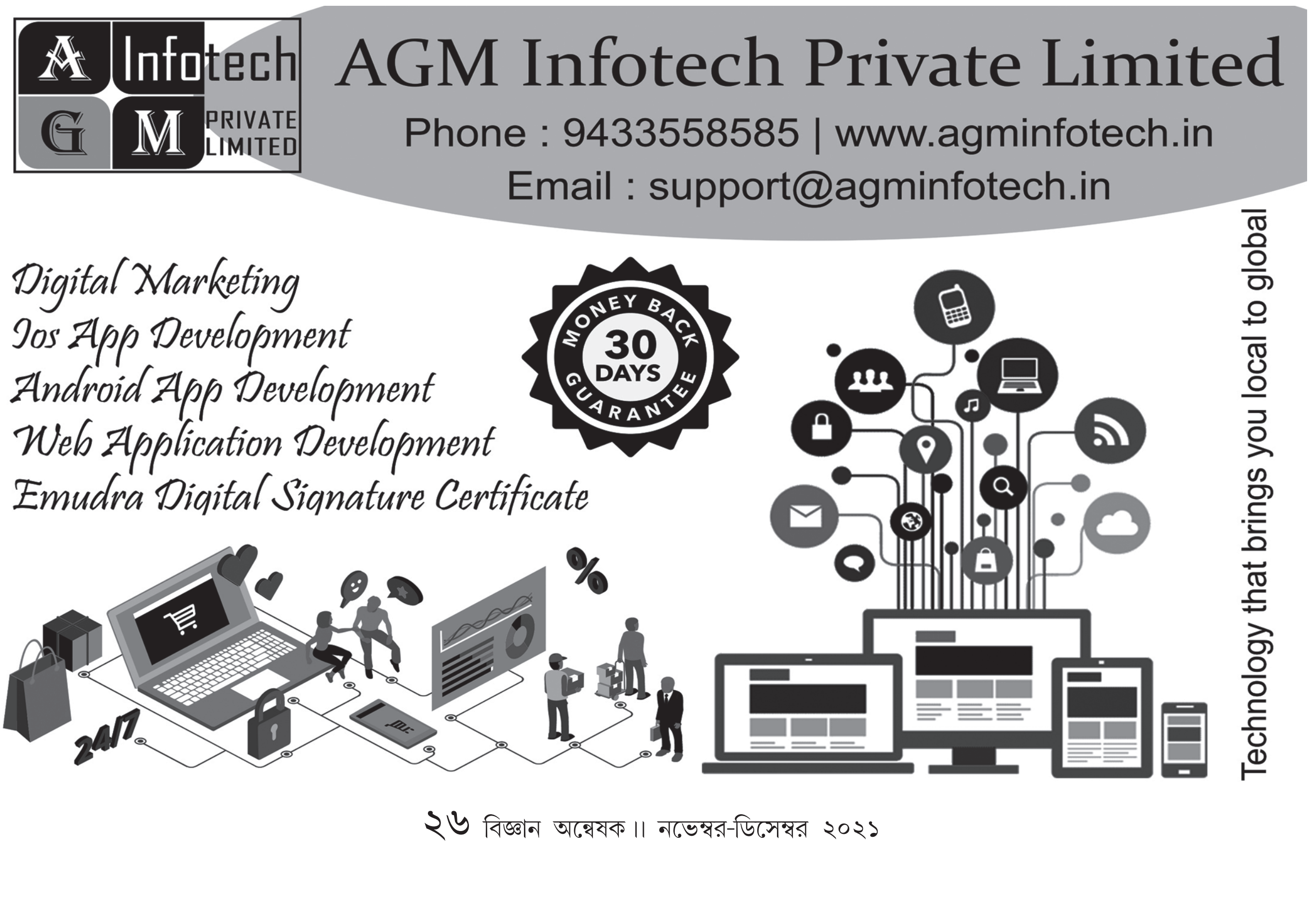

প্র বী র ব সু

হিমালয়ের জনজাতি

উত্তর পূর্ব ভারতের একটি জনজাতি

মানুষ সন্ধানী। আদিকাল হতে সে কেবল খুঁজে খুঁজে বেরিয়েছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উন্মেষ হয়নি তখনও সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বহু জাতি এই হিমালয় পেরিয়েই এদেশে প্রবেশ করেছে। চিন, তিব্বত, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, কুমায়ুন, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হিন্দুকুশ, আফগানিস্থান হয়ে হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৪০ মাইল এবং প্রস্থে কোথাও ৫০০ মাইল, বা কোথাও আরও বেশি। খ্রিস্ট জন্মেরও সহস্র বছর আগে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে দাসরা এসে বসতি গড়ে পাহাড়ে। কালে কালে আর্যদের সঙ্গে মিলেমিশে নানান উপজাতিয় গোষ্ঠী নিজ নিজ রাজ্য অর্থাৎ জনপদ গড়ে তোলে। কাশ্মীরে ডোগরা, হিমাচলের গদ্দী সম্প্রদায় আজও হিমালয়ের একটি বিখ্যাত যাযাবর উপজাতি। পূর্ব ভারতে কাড়োয়ো, মালফোঁড়, কীচক নামে উপজাতি রয়েছে। এদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও সাহিত্য বর্তমান। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যেমন অনেক মিল আবার অমিলও প্রচুর। গ্রীক, পার্সী, শক, হুন, কুষানরা হিমালয়ের বহু উপজাতি গোষ্ঠীর জন্মদাতা। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে বা পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি উপজাতির বাস। এদের মধ্যে অনেক উপজাতিই নিজেদের অস্তিত্ব ভালো-ভাবেই টিকিয়ে রেখেছে। বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে যাযাবর

ডোগরা সম্প্রদায়

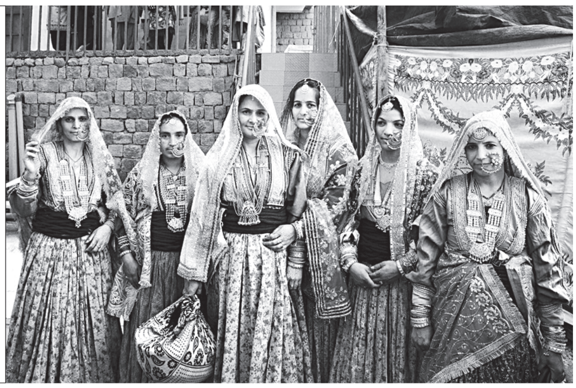

গদ্দী সম্প্রদায়

বৃত্তি পরিত্যাগ করেছে। আবার বহু উপজাতি লুপ্ত হয়েছে বা বিলুপ্তির পথে। আবার অনেকেই ভিন্ন জাতির সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিশে গেছে সাধারণের মধ্যে।

তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিমালয় পেরিয়ে আসা এই জনজাতি গোষ্ঠী দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ক্ষমতার আলোকস্পর্শে অনেকটাই পরিশীলিত হয়েছে। তাদেরই কিছু গোষ্ঠী আজও একত্রিত হয়ে দলবদ্ধভাবে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের জীবনের সমস্যা, তাদের জীবনের কিছু উপাখ্যান আপনাদের জানাব।

টোটো জনজাতি : পৃথিবীর লুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে টোটোরা অন্যতম। বিশ্বের এই বিশেষ জনগোষ্ঠীর একটিই গ্রাম। সে গ্রামের

টোটো মা ও শিশু

নাম টোটোপাড়া। ভুটান-বাংলা সীমান্তে হিমালয়ের পাদদেশে এর অবস্থান। এই প্রজাতির মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই বলে শোনা যায়। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর সীমান্তে তোর্সা নদীর তীরে পাহাড়ের কোলে অরণ্যবেষ্টিত ছবির মত এই গ্রামটি আলিপুরদুয়ার মহকুমার মাদারিহাট থানার অধীন। বছর পনেরো আগেও এই গ্রাম ছিল দুর্গম এবং বর্ষাকালে ওখানে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্যই ছিল। এখন বাসরাস্তা হয়েছে। টোটোপাড়ার তিনদিকে উঁচু পাহাড় একদিকে অনেকটা নীচে তোর্সা নদী। এই পাহাড়গুলি ভুটান হিলস্ নামে পরিচিত। তোর্সা এখানে বিশাল চওড়া। বর্ষায় এর রূপ হয় প্রলয়ঙ্করী।

টোটোরা সরল ও পরিশ্রমী। এদের গায়ের রঙ বাদামী। দেখতে অনেকটা ভুটিয়াদের মত। টোটোদের ইতিহাস শতাব্দী প্রাচীন। টোটোরা সংখ্যায় বর্তমানে ১০০০-এর কিছু বেশি। এদের বংশবৃদ্ধির হারও খুবই কম। তাই এই উপজাতি ক্রমহ্রাসমান এবং তা সরকারি ও আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। টোটোদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান এখনও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। দেশি বিদেশী বহু সংস্থা কাগজে কলমে অনেক কথা বললেও এদের জীবনযাত্রার মান, আর্থিক সামাজিক উন্নতি কিছুই হয়নি। এই টোটোপাড়ার টোটো ভাষায় কোনো হরফ বা বই নেই। শুধুই আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। যেমন টোটোদের ভাষায় জলকে তি, ভাতকে আমা বলে। শিক্ষা বলতে টোটোপাড়ায় একটিমাত্র প্রাথমিক স্কুল ও সবে চালু হওয়া একটি ছোট্ট মাধ্যমিক স্কুল। একটিই মাত্র উত্তরবঙ্গিয় ক্ষেত্রীয় গ্রামীন ব্যাঙ্ক হয়েছে। টোটোরা হিন্দুপ্রধান হলেও খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ কেউ কেউ আছেন।

জনসংখ্যা দিন দিন কমে যাওয়ায় টোটোদের লাইগেশন বা নির্বীজকরণ নিষিদ্ধ।

টোটোপাড়ায় শিল্প বলতে কিছুই নেই। আগে কমলালেবুর চাষে সুনাম ছিল। এখন আর কমলালেবু উৎপাদন হয় না। তবে উন্নতমানের সুপারি গাছের চাষ হচ্ছে। উপার্জনের একমাত্র পথ সুপারি ও আদা চাষ। টোটো উপজাতি সত্যিকারের বঞ্চনার শিকার। বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে এই উপজাতি। তাই বেঁচে থাকবার জন্য টোটো উপজাতি সংরক্ষণ চাইছেন। টোটোদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে আর পাঁচটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত। টোটোরা জমি সমস্যায় জর্জরিত। এছাড়া নামকাওয়াস্তে আদিবাসী কল্যাণ কেন্দ্র থাকলেও তাতে টোটোদের কোনো উন্নতি নেই।

লেপচা উপজাতি : হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে লেপচা উপজাতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিশেষতঃ ভুটান, সিকিম, দার্জিলিং, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং নেপালের ইলম জেলায় এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। হিমালয়ের পাদদেশে সিকিম-বাংলা সীমান্তে রয়েছে লেপচা গ্রাম। এছাড়াও লেপচা অধ্যুষিত গ্রাম হিমালয়ের আনাচে-কানাচে লক্ষ করা যায়। জীবনযুদ্ধে অদম্য লড়াই করে লেপচারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। লেপচারা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে তৎপর। লেপচারা খুবই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করে। লেপচা গ্রামের পরিবহন ও যোগাযোগের বড় অভাব। এছাড়াও পানীয় জলের অভাব এদের চিরকালীন। এরা প্রধানত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান

লেপচা মহিলা

ধর্মে দীক্ষিত। লেপচাদের নিজস্ব স্ক্রিপ্ট বা নিজস্ব ভাষা আছে। এমনকি হাজার বৎসর পূর্বের পুঁথিও এদের রয়েছে। লেপচারা শহুরে কোলাহল বর্জিত শান্ত পাহাড়ি পরিবেশ পছন্দ করে। লেপচারা বাঁশ ও কাঠের সৌখিন শিল্পকলা প্রস্তুতিতে পারদর্শী। আদিবাসী লেপচাদের ঘর-বাড়ি, কাঠ ও লতাপাতা দিয়ে তৈরি। লেপচা সমাজ প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন। স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। অবশ্য লেপচারা পশ্চিমবঙ্গে তপশিলী হিসাবে স্বীকৃত।

বনরাওয়াত উপজাতি : হিমালয়ের পথে পথে বিভিন্ন জনজাতি, আদিবাসীদের নানা ধরনের জীবনযাত্রা। এবার আমরা উত্তরাখন্ডের নেপাল সীমান্তবর্তী ধারচুলার ওপরে একটি উপজাতি সমাজ বনরাওয়াতদের কথা বলব। কথিত আছে পিথোরাগড় জেলার আলখত গ্রামে বহুদিন আগে রাওয়াত গোষ্ঠীর রাজা/সরদার অনুজ ভাইকে নির্বাসন দিলে উনি অনুগতদের নিয়ে ধারচুলার ওপরে নিজের এলাকার পত্তন করেন। এরাই বনরাওয়াত উপজাতি নামে পরিচিত। বর্তমানে এদের সংখ্যা তিনশত বা সামান্য বেশি। এদের কোনও প্রথাগত শিক্ষা বা নিশ্চিত ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা নেই। ITBP এবং BRO-র কাছ থেকে সামান্য চিকিৎসার ব্যবস্থা পায়। সাধারণ চাষবাস ও ভেড়া পালনই এদের জীবনধারণের মূল উপকরণ। কখনও কখনও ITBP এবং BRO-এর সৌজন্যে সামান্য কিছু কাজ মেলে। আজকাল এদের অনেকে পাহাড় থেকে অনেক নীচে নেমে এসে কিছু কাজের সন্ধান করে কিন্তু নেপালি ও গোর্খাদের দাপটে সে কাজও তারা করে উঠতে পারে না। এদের স্বল্প সংখ্যার জন্য এরা সর্বদাই অত্যাচারিত। এমনকি কোনো রাজনৈতিক দলও এদেরকে নিয়ে ভাবে না।

টনস্ ভ্যালি অঞ্চলের জনজাতি : এবার আমরা চলে যাব হর-কি-দুন বা টনস্ ভ্যালি অঞ্চলে। হর-কি-দুন অর্থাৎ শিবের উপত্যকা। এই টনস্ ভ্যালি অঞ্চলে মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে দ্রৌপদী বিবাহ প্রথার (এক সতীর বহু পতি) প্রচলন রয়েছে। এই বিশেষ অঞ্চলে পরিবারের বড় ভাই যদি কোনো নারীকে বিবাহ করেন তবে সেই পরিবারের সকল ভাই সেই নারীর স্বামী হিসাবে গণ্য হবে। এমনও দেখা যায় পরিবারের ছোট ভাই হয়ত এত ছোটো যে তাকে বড় করে তুলেছেন সেই বৌদি প্রকৃত অর্থে তাঁর স্বামী। এই প্রথা এ অঞ্চলের বহু প্রাচীন প্রথা এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী চলে আসছে। তবে আধুনিক নব্য সমাজ ব্যবস্থা আর ঐ পুরাতন প্রথা মানতে চাইছে না।

ওসলা গ্রামের মা ও শিশু

ফলে অধিকাংশ পরিবারে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। ফলে অধিকাংশ পরিবারে উপযুক্ত বয়স্ক পাত্র/পাত্রী নিজেরাই গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে শহরাঞ্চলে গিয়ে তাদের পছন্দের পাত্র/পাত্রীকে বিবাহ করছেন। তবে এর পেছনেও রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা। প্রধানত দরিদ্র পরিবারের জন্য কন্যাপণ দেওয়ার অক্ষমতা এবং সর্বোপরি পারিবারিক সম্পত্তি বিভাজন রোধের জন্যই এই ব্যবস্থা আজও চলে আসছে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখেছি শুধুমাত্র হর-কি-দুন উপত্যকার সাঁকরী, তালুকা, সীমা, ওসলা, হর-কি-দুন বাদেও হিমাচলের কিন্নর ভ্যালির কল্পা, সাংলা, ছিটাকুলেও এই দ্রৌপদী প্রথার চল রয়েছে। আবার এইসব অঞ্চলে অধিবাসীরা কৌরব ও পান্ডব দুটি ভিন্ন দলের সমর্থক। টনস্ ভ্যালি অঞ্চলে ওসলা গ্রামে দুর্যোধনের মন্দিরও রয়েছে।

গুর্জর জনজাতি : হিমালয়ের অন্দরে হাঁটাপথে বিশেষতঃ গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পাহাড়ি পথে মাঝেমাঝেই দেখতে পাওয়া যায় এক বিশেষ জনজাতির। এরা এক বিশাল দলবল নিয়ে পাহাড়ি পথে পরিক্রমা করে চলেছে। পুরুষ, স্ত্রী, শিশু এবং সঙ্গে মহিষ, ভেড়া, ছাগল নিয়ে এদের যাত্রা। এদের হাঁটাপথে সর্বদাই নজর পানীয় জলের দিকে তাবু খাটানোর মত খোলামেলা জায়গা, সঙ্গে তাদের নিজস্ব গৃহপালিত প্রাণীদের জন্য বিস্তীর্ণ বুগিয়াল। এভাবে পাহাড়ি পথে চলতে চলতে পছন্দসই জায়গা পেলেই সেখানে প্রথমে তারা তাবু খাটিয়ে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে। সঙ্গে গৃহপালিত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য চারণভূমি বিশেষতঃ বুগিয়ালের মধ্যে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশেই ঐ সব প্রাণীদের নিত্যদিনের খাদ্য যাতে জোটানো সম্ভব হয়। আবার এদের সঙ্গেই থাকে বেশকিছু হিংস্র এবং শক্তিশালী কুকুর যারা তাদের সঙ্গের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জঙ্গল পাহাড়ের হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এইসব দল বেশ কিছুদিন এক এক অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আবার সে অঞ্চলের খাবার-দাবার শেষ হয়ে গেলে তারা বেড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন অঞ্চলের খোঁজে। এরা যাযাবর জনজাতি, এদের নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। পথেই এদের জীবন। দুধ, দই, ঘি, মাখন এবং ভেড়া ও ছাগলের মাংস বিক্রি করেই এরা জীবন ধারণ করে। হিমালয়ের গভীর জঙ্গল পাহাড়ে ঘুরে ঘুরেই এদের যাযাবর জীবন। খুব শীতে এরা পাহাড়ের নিচের দিকে নেমে আসে আবার গরম পড়লে ধীরে ধীরে উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। পাহাড়ি অঞ্চলে ট্রেকারদের সঙ্গে এদের প্রায়ই দেখা হয়। এই ট্রেকারেরা প্রয়োজনে দুধ, দই, ছাগল-ভেড়ার মাংসও এদের থেকে সংগ্রহ করে। হিমালয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে এই গুর্জর জনজাতি প্রচুর নজরে আসে।

যাই হোক, একথা মানতেই হবে এইসব আদিবাসী যারা দীর্ঘদিন ধরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে তাদের মত করে বসবাস করছে তাদের পোশাক, শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা, ভাষা, জীবনযাপন পদ্ধতিতে নানারকম বৈচিত্র্য থাকলেও তারা সকলেই জাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। বহু উপজাতিই ত্যাগ করেছে পূর্বসুরীর হিংস্রতা। নির্মম পশু শিকারের প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সভ্যতার আলোকস্পর্শে তারা আলোকিত হচ্ছেন।

লেখক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মী, ভ্রমণ পত্রিকার সম্পাদক।

email: prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

হিমালয়ের বিপন্ন পরিবেশ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

উপগ্রহ চিত্র— বন্যায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে

হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এ অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ মিশ্রণ রয়েছে। হিমালয়ের বন্যপ্রাণ ও মানুষ বনজ সম্পদ থেকে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা গ্রহণ করে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য সরবরাহ, সাংস্কৃতিক (নান্দনিক, ধর্মীয়), সমর্থ্যকারী (মাটি গঠন এবং জলের চক্র) এবং নিয়ন্ত্রক (ক্ষয়, জলবায়ু) পরিষেবাগুলি। হিমালয়ের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জটি হল এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলিকে টেকসইভাবে ব্যবহার। বাস্তুতন্ত্রের এই পরিষেবাগুলি সবটাই নির্ভর করে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি, যেমন জলপ্রবাহ, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, ভূমির ক্ষয় ও ভূমির আবরণ ইত্যাদির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের উপর। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ভারসাম্য সাধারণতঃ বিঘ্নিত হয় না। এগুলি বিঘ্নিত হয় যখন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের চাপ বেশি হয়ে পড়ে। হিমালয়ের ক্ষেত্রে আরো একটি প্রভাব রয়েছে তা হল ভূ-আন্দোলনের প্রভাব যার জন্য হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র কিছুটা ভঙ্গুর এবং তা চাপের মুখে রয়েছে।

একটা ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে হিমালয়ে ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে যে বিপুল জনবসতি রয়েছে তাদের খাদ্য ও বাসস্থানের সুরক্ষা, জীবিকার নিশ্চয়তা ও বহুমুখী উন্নয়ন দরকার। দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় একদিকে যেমন জনবসতি বাড়ছে সেই সঙ্গে চলছে বিপুলভাবে উন্নয়নের কর্মকান্ড। অপরিকল্পিত উন্নয়ন ইতিমধ্যে ঝুঁকিপ্রবণ এবং পরিবেশগতভাবে ভঙ্গুর অঞ্চলটিকে আরও দুর্বল এবং আরও "মারাত্মক" করে তুলেছে। এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও যুক্ত যা ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের দুর্বলতাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

এই নিবন্ধে আমি পরিবেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোকপাত করব যার মধ্যে প্রধান হল জল। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল জল যা উচ্চ হিমবাহ এবং পাহাড় থেকে সমভূমিতে প্রবাহিত হয়। এই সম্পদটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার উন্নয়নের সুযোগের দিক এবং তা বাস্তুতন্ত্র এবং অর্থনীতিকে কতটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা দরকার। বর্তমানে হিমালয় জুড়ে নদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বাঁধ তৈরির প্রবণতা তুঙ্গে। হিমালয়ের এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ভারতের অনেক রাজ্য ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিপুল পরিমাণে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের দায় নিয়েছে। উত্তরাখণ্ড একাই গঙ্গা অববাহিকায় প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় প্রায় ৭০০টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে এবং আরো প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে।

জলবিদ্যুতের উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি দেশকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সরবরাহ করে এবং এটি হিমালয়ের রাজ্যগুলির আয়ের উৎস। এর পিছনে আরো একটি যুক্তি কাজ করে যে এই বিকল্প শক্তি কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারে।

জলবিদ্যুতের সমর্থনে আমরা যত কথাই বলি না কেন, হিমালয়ের এই ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের পটভূমিকায় এই ধরনের এবং এত বিপুল সংখ্যায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভাবতে হবে। আমরা যদি সবদিক খতিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারব এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি হিমালয় পরিবেশকে কতটা ঝুঁকি এবং বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির ফলে যে ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় ও ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে প্রধান একটি হল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় বনভূমি বা বনভূমির জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে। এর ফলে যা ঘটে তা হল :

- বনভূমি হ্রাস ও বন্যপ্রাণ ধ্বংস, যার ফলে বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- বন চলে যাওয়ার ফলে ভঙ্গুর পার্বত্য এলাকার ভূমি উন্মুক্ত হয়ে যায় ও তা ধসের প্রবণতা বাড়ায়।
- উন্মুক্ত ভূমি ভূমিক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ও নদীবাহিত পলির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যা নিম্নভূমিতে নদীর নাব্যতা হ্রাস করায়।
- বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি কীভাবে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে তার বেশ কিছু উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। হিমালয়ের বেশ কয়েকটি উচ্চভূমি সাম্প্রতিক কালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, যার ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডে আকস্মিক বানে প্রায় ৫৭০০ জন মারা যায়, বিপুল ধস নামে ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হয়। এর পরে, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বিপর্যয়ের জন্য দায়ী নীতিগত ব্যর্থতাগুলি তদন্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি জাতীয় প্যানেল তৈরি বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তদন্ত পরিচালনা করার পরে, প্যানেল এই "দুর্যোগ-প্রবণ" অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।

প্রচুর বৃষ্টি উত্তরাখণ্ডে বন্যা নিয়ে এসেছে

এ বছর ৭ ফেব্রুয়ারি চামোলিতে বন্যা ও তুষার ধ্বসের কারণে দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনামূলক সংস্থা আরএমএসআই ১১ ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিবেদনে বলেছে যে এই বিপর্যয়ের ঘটনা দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে কিন্তু আরো অনেক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে যেগুলি বন্যা, ক্লাউডবার্স্ট, গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট, তুষারপাতের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

ভূমিকম্প ও ভূমি ধস

নেপালের ভূমিকম্প

ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে হিমালয় একটি নতুন ভঙ্গিল পর্বত বা ফোল্ড মাউন্টেন। এই হিমালয় জুড়ে রয়েছে অগণিত চ্যুতিরেখা যেগুলি ধরে হিমালয় পর্বতে ভূ-আন্দোলন বা টেকটনিক মুভমেন্ট ঘটছে। এই ভূ-আন্দোলনের ফলশ্রুতি হল ভূমিকম্প। হিমালয়ের প্রায় সবটাই ভূমিকম্প প্রবণ। কবে, কখন, কোথায় ভূমিকম্প ঘটবে তা আগাম বলা সম্ভব হয়নি এখনও। কাজেই যেখানেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হোক না কেন তা ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে থাকবেই।

ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে, হিমাচল প্রদেশের মোট ভৌগোলিক অঞ্চলের ৯৭.৪২% ভূমিধসপ্রবণ। হিমাচল সরকারের নিজস্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেল কর্তৃক প্রকাশিত ল্যান্ডস্লাইড বিপদ ঝুঁকি মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বিপুল সংখ্যক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূমিধসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং কমপক্ষে ১০টি মেগা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র মাঝারি ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিধস অঞ্চলে অবস্থিত।

আরএমএসআই (হিন্দুস্থান টাইমস ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১) দেখিয়েছে যে অন্ততঃ ন'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে আছে ধৌলি গঙ্গায় লতা তপোবন (১১১ মেগাওয়াট), অলকানন্দা বিষ্ণুপ্রয়াগ (৪০০ মেগাওয়াট), ভাগীরথীতে তেহরি (১০০০ মেগাওয়াট), বিষ্ণুগাদ পিপালকোটি (৪৪৪ মেগাওয়াট), অলকানন্দায়, তমসায় নাইটওয়ারী-মরি (৬০ মেগাওয়াট), মন্দাকিনীতে ফাতা বায়ুং (৭৬ মেগাওয়াট) এবং সিঙ্গোলী ভাটওয়ারী (৯৯ মেগাওয়াট)। এই প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য মেগাওয়াট প্রতি সাত থেকে আট কোটি টাকা খরচ হয়। ভেবে দেখুন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এগুলি ধ্বংস হলে কী বিশাল পরিমাণে জনগণের সম্পত্তির ক্ষতি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কারণে হিমালয় অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে এবং ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে পারে তার আগাম কিছু লক্ষণ

ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি যেভাবে বিপর্যয় ডেকে আনছে তা হল, হিমালয়ের উচ্চভূমিতে জলাধারে বিপুল পরিমাণ জল সঞ্চয় করে রাখার ফলে সেখানকার সলিল পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। আকস্মিকভাবে বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যাচ্ছে, বাষ্পীভবনও বেড়ে যাচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে তাপমাত্রা। ফলে হিমবাহগুলি পিছনে সরে যাচ্ছে। হিমবাহের মুখে এর ফলে প্রচুর পরিমাণে হিমবাহবাহিত পলি (টারমিনাল মোরেইন) জমা হচ্ছে ও হিমবাহ হ্রদগুলির সৃষ্টি হচ্ছে। এই মোরেইনগুলি দুর্বল বাঁধের কাজ করে। এক সময় উচ্চ অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টি হলে এই সব হ্রদগুলি জল ধরে রাখতে পারে না ও তার ফলে আকস্মিক বন্যার প্রবণতা দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে

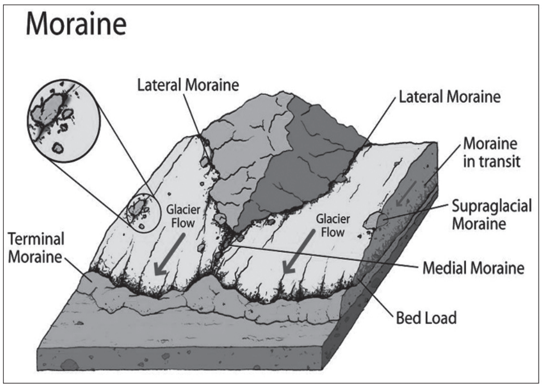

মোরেইন তৈরীর পদ্ধতি

মোরেইন

তিস্তায় যে বন্যা হয়েছিল তা এই রকম এক বা একাধিক হ্রদ ভেঙে যাওয়ার পরিণতিতে ঘটেছিল।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীগুলিতে যেমন বন্যার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে তেমনই অন্য সময়ে স্বাভাবিক জলপ্রবাহ, যার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পগুলি ডিজাইন করা হয়েছে, তা হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্যই মার খেয়ে যেতে পারে। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কীভাবে করা হবে তা বিবেচনায় দেখাও একটা বড় কাজ।

উন্নয়নের কৌশলগত দিক

প্রশ্ন এই অঞ্চলের জন্য উন্নয়ন কৌশল কী হওয়া উচিত? আমাদের একটা প্যান-হিমালয়ান পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা প্রয়োজন যাতে হিমালয়ের রাজ্যগুলি একটা সাধারণ নীতি গ্রহণ করতে পারে। সেই পরিকল্পনা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ— বন, জল, জীববৈচিত্র্য, খাদ্য, পর্যটন-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে ও সেই সাথে পরিবেশগত হুমকিগুলিকে এমনভাবে মোকাবিলা করতে হবে যাতে ব্যয় বৃদ্ধি না হয়। যে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করা দরকার আসুন তা অন্বেষণ করা যাক।

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতে যে পূর্তকর্ম হয় তা ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপর প্রভাব ফেলে। এতে যে বিস্ফোরণ ও খনন হয় তা ভূমির দুর্বলতা এবং ভঙ্গুরতা আরও বাড়িয়ে তোলে যা এখনও পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করা ও বোঝা যায়নি। এই ধরনের নির্মাণের চারটি বড় প্রভাব :

- ভূতাত্ত্বিক প্রভাব— ভূমিধস, যার ফলে রাস্তা, খামার, ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- জলবিদ্যুৎ প্রভাব— ঝর্ণা এবং ভূগর্ভস্থ জলের উৎস শুকিয়ে যাওয়া; এর ফলে যে হারে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার কথা তা নাও হতে পারে।
- নদী বরাবর ম্যাক ডাম্পিং যা বন এবং চারণভূমিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।
- নিরাপত্তার অবহেলা হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বাড়ে।

যা করা প্রয়োজন তা হল :

- আরও বিপর্যয় রোধ করার জন্য হিমালয়ের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে সাময়িক বিরতি দেওয়া দরকার। গ্রিনট্যাগিংয়ের উপর ভিত্তি করে জলবিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বন্ধ করা। হিমালয়ের ক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের জন্য 'পুনর্নবীকরণযোগ্য' ট্যাগটি সরিয়ে নেওয়া দরকার।
- হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ বিকাশের জন্য নির্মাণ কাজের তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের একটি স্বাধীন বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন কমিশন করা উচিত। এর ভিত্তিতে পরিবেশের উপর প্রভাব নির্ধারণের শর্তগুলির সংশোধন করা দরকার।
- নির্মাণাধীন এবং পরিচালিত সমস্ত প্রকল্পের সামাজিক, পরিবেশগত এবং সুরক্ষা মানদণ্ডগুলির সম্মতিতে একটি স্বাধীন তদন্ত বা নিরীক্ষণ হওয়া উচিত, বিশেষত এমন প্রকল্পগুলিতে যেখানে ইতিমধ্যে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। হিমালয়ে একটি স্বাধীন বাঁধ সুরক্ষা সেল দরকার যাতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের সদস্য থাকবে। ভারতের বাঁধ সুরক্ষা আইন দরকার।
- পরিকল্পনার পর্যায়ে নাগরিকদের জড়িত হওয়া এবং জনমত সম্মত পদ্ধতিগুলি জোরদার করা এবং জনসাধারণের দ্বারা উত্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অভিযোগের প্রতিকার ব্যবস্থা যথাযথ পোস্ট ক্লিয়ারেন্সে রাখা দরকার।
- সব থেকে বড় কথা প্রতিটি স্তরে সমস্ত তথ্য জনগণ ও স্টেকহোল্ডারদের সামনে পেশ করা দরকার যাতে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বা যারা পরিবেশ নিয়ে লড়ছে তারা যেন সঠিক সময়ে প্রকল্পগুলির ত্রুটি নিয়ে সোচ্চার হতে পারে।

হিমালয়ের ভঙ্গুর পরিবেশ এবং হিমালয় জুড়ে যে ভূ-আন্দোলন (tectonism) প্রতিনিয়ত চলছে তার ফলে হিমালয়ের বহু এলাকা পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপরিমিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিগুলির সাথে মানবসৃষ্ট ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিবেশের পরিবর্তন যা হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রকে আরো বড় ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

লেখক ভূতাত্ত্বিক ও গবেষক, বিজ্ঞান লেখক।
email:sengupta-pradip@yahoo.com • M. 9433714509

BIGYAN ANNESWAK VOL : 18 Issue No. 6 November-December 2021 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 15/-
ISSN 2582-5674

রা জা রা উ ত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী — লাল পান্ডা

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Red Panda*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Ailurus fulgens*

এই স্তন্যপায়ীটি হিমালয়ের অত্যন্ত দুর্লভ ও বিপদগ্রস্ত প্রাণী। হিমালয়ের এন্ডেমিক প্রজাতি হিসেবে কেবলমাত্র হিমালয়ের আশপাশের তিনটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ—ভারত, নেপাল ও দক্ষিণ চিন। তবে অল্পকিছু ভুটান ও মায়ানমারে ভারত সংলগ্ন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া গেছে। সারা পৃথিবীতে ১০,০০০ এর নীচে এর সংখ্যা থাকতে পারে IUCN এর লালতালিকায় স্থান পাওয়া এই প্রাণীটি প্রধানতঃ বাঁশ খেতে অভ্যস্ত, তবে এরা মাংসাশিও বটে।

সরিসৃপ — হিমালয়ের ড্রাগন

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Variegated Mountain Lizard*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Japalura variegata*

এই সরীসৃপ হিমালয়ের ড্রাগনরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা একপ্রকারের আগামিড জাতীয় গিরগিটি। হিমালয়ের সংলগ্ন বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত, ভুটান এবং নেপাল প্রভৃতি দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি এখনও। এখনও এদের অবস্থা তুলনামূলক কম সংকটজনক।

পক্ষী — হিমালয়ের শকুন

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Himalayan Vulture/ Himalayan Grifron Vulture*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Gyps himalayensis*

এই পাখিটি অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতি। প্রধান হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা শকুনদের মধ্যে অন্যতম একটি বড় প্রজাতি। হিমালয়ের ৪০০০-১৮,০০০ ফুট উচ্চতায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। প্রধানত কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্থান, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, চিন ও মঙ্গোলিয়াতে পাওয়া যায়। এরা IUCN এর লাল তালিকা অনুসারে বিপন্নপ্রায় প্রাণী।

অমেরুদন্ডী — বাংলা নাম তরোওয়ারী পুচ্ছ প্রজাপতি

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Sixbar Swordtail*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Graphium eurous*

প্রজাপতির এই তলোয়ারপুচ্ছ প্রজাতি হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়। মূলত উত্তর পাকিস্তান, ভারত (জম্মু ও কাশ্মির, হিমাচলপ্রদেশ, গাড়োয়াল ও কুমায়ুন, সিকিম, আসাম ও মণিপুর), নেপাল, উত্তর মায়ানমার, চিন ও তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এদের নিয়েও খুব বেশি বিজ্ঞানসম্মত তথ্য নেই। তবে এখনও এরা বিপন্ন তালিকায় নাম না লেখালেও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে কেবলমাত্র দেখতে পাওয়া যায়।

email:rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178

কবিতায় হিমালয়

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

হিমালয়ের প্রার্থনা

দিয়েছি তো—
যা চেয়েছো সব,
বুক থেকে মণি মুক্তো, স্তন সুধা,
সব দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

আরো আছে,
দিতে পারি,
মেদ মজ্জা, হাড়, সবকিছু—
চরাচরে যা আছে দেবার,
সব দেব।

পর্দা সরিয়ে তবু কেড়ে নাও কেন?
ঢাকা থাক হৃদয়বৃত্তির কিছু আমন্ত্রণ,
কিছু লজ্জা অবগুণ্ঠনের,
কিছু আলো, কিছু ছায়া,
কিছু অহংকার—
ঢাকা থাক মেঘের ওড়নায় কিছু হাহাকার।

অমর ঘোষ

উৎস

জলরেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে
পৌঁছে যাই পাথরের স্তূপে
বরফের রাজ্যে

এই বরফই তো জল
জল মানে নদী

জলের মুকুটমণি ত্রিশূল
হিমালয়

সভ্যতার উৎসভূমি
আমার ভারতভূমি—

চন্দ্রশেখর ঘোষ

হিমালয়

বিশালতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আমার
শীর্ষ ছুঁয়ে থাকা মেঘমালা নিয়েও কোনো প্রশ্ন নেই
শরীরের ভাঁজে রহস্য জ্যোৎস্নার আলো লুকিয়ে রাখা নিয়েও
কোনো প্রশ্ন নেই
সাগরের ভেতর থেকে জেগে ওঠা তুমি মাথা তুলে
আজও ঋজু দাঁড়িয়ে
প্রশ্ন এই—
দৃপ্ত ভঙ্গিমা ঋজুতা নিয়ে আমিও কি দাঁড়াব না
এই অন্ধ সময়ের ঘোলা জল থেকে?

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365, অজয় মজুমদার M. 8918824281 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 • দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 • বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231